সম্পাদকীয়

স্বপন পুরে চল্ যাবি আয়

খরস্রোতা এক মহানদীর দুই প্রান্তে অসংখ্য মানুষের বাস। নদী যতোই মোহনার দিকে এগিয়েছে ততই জনপদ বড়ো হোয়েছে। দীর্ঘ নদীর উপরে কোনো সেতু না থাকায় দুই প্রান্তের মানুষজন পরস্পরকে চেনে না, বোঝে না, অথচ তাঁদের একইরকম সমস্যা, জীবনধারণের সমস্যা। উভয় প্রান্তের বাসিন্দারা একই গান গায়:-স্বপনপুরে কে যাবি রে? স্বপনপুরে চল্ যাবি আয়। স্বপনপুর মানে বৈষম্যহীন ভূখণ্ড।

একদল 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' কাজে স্ব-নিযুক্ত মানুষ এই নদীর উপর প্রায় ১০০ বছর ধরে সেতু বানাতে শুরু করেছেন। অর্থবল নেই, লোকবল নেই, শুধুমাত্র মনোবলের জোরে সেতু বানিয়েই চলেছেন। উদ্দেশ্য একটাই— নিপীড়িতদের এই দ্বিখন্ডিত সত্ত্বাকে ঘনিষ্ঠ করা । পরস্পরকে একই সংগ্রামের সাথী করা, নিয়মিত আলাপচারিতা, মত বিনিময়, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান এ বিভেদ বিভাজন দূর করতে পারে। সেতু নির্মাণকর্মীরা বুঝে উঠতে পারে না কেন এই বিভিন্নতা, সমস্যা তো উভয়পক্ষের একই। দলিত দরিদ্র মানুষদের সমস্যা বুঝতে তো 'পণ্ডিত' হোতে হয় না। সমস্যা একটাই। এক প্রান্তের মানুষ মনে করেন:- কার্ল মার্কস রচিত *কমিউনিস্ট ইস্তাহার*-ই তাঁদের স্বপনপুরের পথ দেখাবে। অপর পক্ষের মানুষরা মনে করেন:- আম্বেদকর লিখিত *অ্যানহিলেসন অফ কাস্ট*-ই তাঁদের সুদিনের পথ নির্দেশিকা। সেতু বন্ধনের কর্মীরা এই ফারাককে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানান যে কার্ল মার্কস ও আম্বেদকর দুই মেরুর বাসিন্দা ছিলেন না। সেতুবন্ধনই পারবে আপাত ভিন্ন মতাবলম্বীদের ময়দানের লড়াইয়ে হাতে হাত ধরে বাঁচতে। সেতুকর্মীদের মধ্যে এক কর্কট আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী নানা আঘাতের পরেও গান গেয়ে ওঠেন:-

হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে
দেখা হবে তোমায় আমায়
অন্য গানের ভোরে।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
একলব্য উপাখ্যান	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩
আমার চেতনায় আম্বেদকর	মনোরঞ্জন ব্যাপারী	১১
আম্বেদকর তুমি কার	দেবী চ্যাটার্জী	২২
এক মার্কসবাদীর চোখে আম্বেদকর	ধ্রুব চৌধুরী	২৯
আম্বেদকর: মনুসংহিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপকার	গুরুপ্রসাদ কর	৩৭
একটি অসম্পূর্ণ বৃত্তের সন্ধানে আম্বেদকরের ভারত ও কমিউনিজম	কণিষ্ক চৌধুরী	৪৪
একজন আম্বেদকরবাদীর চোখে কাশ্মীর সমস্যা	সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস	৫২
অজগর	সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮
সমন্বয়ের প্রশ্নে ড. বি আর আম্বেদকর	চণ্ডালিনী	৭২
আম্বেদকরের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা	মেরুনা মুর্মু	৮৪
আম্বেদকরের মা, মাটি ও মানুষ	স্মৃতিকণা হাওলাদার	৮৯
ভারতীয় মার্ক্সবাদ প্রসঙ্গে আম্বেদকর	এস কে লিম্বালে	৯২
বৌদ্ধ দর্শন, মার্ক্সবাদ ও ড. আম্বেদকর	অর্জুন ডাঙ্গলে	১০৮
রামরাজ্য ও আম্বেদকর	প্রবীর মুখোপাধ্যায়	১১০
ভারতের সংবিধান কতটা আম্বেদকরের সংবিধান	হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী	১১৫
এ ভূখণ্ডে জাত-শ্রেণি সম্পর্ক	অনন্ত আচার্য	১২৩

একলব্য উপাখ্যান

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

একলব্যর গুরুদক্ষিণা। গল্পটি আশাকরি সকলেরই জানা। *মহাভারত*-এর আদিপর্ব-য় দ্রোণ-একলব্য উপাখ্যানটি আছে। তবে সংস্কৃত *মহাভারত* আর কজন এখন পড়েন! বাঙলা অনুবাদ, সারানুবাদ, কাশীরাম দাস প্রমুখের পদ্য রূপান্তর--- এগুলি থেকেই *মহাভারত*-এর মূল আখ্যান ও বেশকিছু উপাখ্যান জানা হয়ে যায়।

মহাভারত-এর সব বাঙলা রূপান্তরে অবশ্য একলব্য উপাখ্যান থাকে না। যেমন, কবীন্দ্র *মহাভারত* (পরাগলি) ও সঞ্জয়-এর *মহাভারত*-এ এটি নেই। তবে কাশীদাসী *মহাভারত*-এ উপাখ্যানটি যথাস্থানে আছে। পাঠককে মনে করিয়ে দেবার জন্য গল্পটি সংক্ষেপে বলা যাক। রাজশেখর বসুর সারানুবাদে সেটি এরকম:

> নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, কিন্তু নীচ জাতি ব'লে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে বনে চ'লে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মৃন্ময় মূর্তিকে আচার্য কল্পনা ক'রে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।
>
> একদিন কুরুপাণ্ডবগণ মৃগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনুচর মৃগয়ার উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুঁড়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বললেন,

আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করলে কেন? দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর, তুনি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতরচিত্তে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে দ্রোণকে দিলেন। তারপর সেই নিষাদপুত্র অন্য অঙ্গুলি দিয়ে শরাকর্ষণ করে দেখালেন, কিন্তু শর পূর্ববৎ শীঘ্রগামী হ'ল না। অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন।

উপাখ্যানটি পড়ে একটু অবাক লাগে। অতীতের শ্রোতা এটি শুনে কী ভাবতেন তা জানার উপায় নেই। কিন্তু এখনকার পাঠকরা অনেকেই গল্পটি পড়ে দ্রোণ ও অর্জুন দুজনের সম্পর্কেই বিরূপ হন। একলব্যর প্রতি তাঁদের আচরণ অশ্রদ্ধাই জাগায়। উল্টে একলব্য শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। জানতে ইচ্ছে হয় এই উপাখ্যানটি মহাভারতে জায়গা পেল কী করে? এখানে অর্জুনের যে রূপ প্রকাশ পায়, সেটিও খুব ভালো না। ঐ বয়সেই সে চায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মতো কেউ যেন না থাকে, একলব্যর বুড়ো আঙ্গুল কাটার প্রস্তাব সে করেনি ঠিকই, কিন্তু দ্রোণকে সে-ই অনুযোগ করেছিল:

সর্ব্বাধিক প্রিয় শিষ্য ভাবিয়া আমারে।
আমার সদৃশ্য বিদ্যা নাহি দিবে কারে॥
এখন জানিনু প্রভু, সে বাক্য ছলনা।
মোর সম মন্দভাগ্য নাহি কোনজনা।।
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ-কুমারে॥

(কাশীদাসী *মহাভারত*, তারাচাঁদ দাস সং. পৃ.১৪৫)

এখানেও 'নিষাদ কুমার' শব্দটি খেয়াল করার মতো। এই একই কারণে দ্রোণ কিছুতেই একলব্যকে ধনুর্বিদ্যা শেখাতে রাজি হন নি।

দ্রোণ বললেন:

তুই হোস নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদ-নন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন।।
দ্রোণাচার্য্য মুখে হেন নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥

(ঐ, পৃ. ১৪৪)

এখানে 'নিষ্ঠুর' বিশেষণটি খেয়াল করার মতো। সংস্কৃত *মহাভারত*-এর কোনো সংস্করণে 'নিষ্ঠুর' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। বোধহয়, সহানুভূতির বশেই কাশীরাম দাস 'নিষ্ঠুর বাক্য' অর্থে শুধু 'নিষ্ঠুর' লিখেছেন। মূল *মহাভারত*-এ আছে 'ধর্মজ্ঞ দ্রোণ, '' এ ব্যক্তি নিষাদ তনয়'' ইহা বিবেচনা করিয়া রাজপুত্রগণের মুখাবেক্ষায় তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন না।' (বর্ধমান রাজবাড়ী সংস্করণ, অধ্যায় ১৩৪, পৃ.২৯১)

সংস্কৃত *মহাভারত*-এ আবার দ্রোণের প্রত্যাখ্যানের পিছনে অন্য একটি কারণও বলা আছে। অখ্যাতি হওয়ার ভয়ই একমাত্র কারণ নয়। 'রাজপুত্র-গণের সহিত তাহার সম্মেলন সংগত নহে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া ন্যায়জ্ঞ দ্রোণাচার্য ধনুর্বেদ শিক্ষায় সেই একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন না।' (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ)।

অর্থাৎ সংস্কৃত *মহাভারত*-এ দ্রোণের আচরণকে আদৌ 'নিষ্ঠুর' বলা হয় নি, বরং 'ন্যায়জ্ঞ' বলে তাঁর সুখ্যাতি করা হয়েছে।

একলব্য এককথায় বুড়ো আঙুল কেটে দেবার পর দ্রোণ আর অর্জুন দুজনেই বেশ খুশি হয়েছিলেন। কাশীরাম দাস লিখেছেন:

তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
পার্থ জানিলেন গুরু আমারে সদয়।।
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিলা গমন।।

(পৃ. ১৪৫-১৪৬)

সংস্কৃত *মহাভারত*-এ একা অর্জুনের তুষ্ট হওয়ার কথা আছে, দ্রোণের নয়। আর একলব্যর প্রশংসা করার কোনো কথাই সেখানে নেই। কাশীরাম দাস যেন পরোক্ষে অর্জুনের ঈর্ষা আর দ্রোণের অর্জুনপ্রীতির খানিক সমালোচনাও

পরোক্ষে করে রাখলেন।

কাশীদাসী *মহাভারত*-এর অন্য একটি সংস্করণে অনেককটি পাঠভেদ দেখা যায়। যেমন একলব্য উপাখ্যানটি রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় সংস্করণে আলাদা অধ্যায় হিসেবে নেই। 'দ্রোণের নিকট অর্জুনের প্রতিজ্ঞা এবং পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্রশিক্ষা' অধ্যায়ের ভেতরেই উপাখ্যানটি রয়েছে। সেখানেও অবশ্য দ্রোণের প্রত্যাখ্যানের কারণ একই, আর বিবরণও একই:

দ্রোণাচার্য্যের মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
(প. ১১৭)

দ্রোণ-অর্জুন সংলাপ কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তারাচাঁদ দত্ত সংস্করণের সঙ্গে বিশেষ মেলে না:

কর-জোড়ে পার্থ তবে করে নিবেদন।
আমারে নিগ্রহ গুরু জানিনু এখন॥
পূর্ব্বে মোরে কোল দিয়া কৈলা অঙ্গীকার।
তোমার সমান শিষ্য নাহিক আমার।।
তোরে বিদ্যা সব দিব না দিব অন্যেরে।
এক্ষণে কপট প্রভু করিলে আমারে।।
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদকুমারে।।
(পৃ. ১১৮)

উপাখ্যানের শেষটি অবশ্য একইরকম। দ্রোণের গুরুদক্ষিণার দাবি শোনামাত্র:

গুরুর বচন শুনি বিলম্ব না কৈল।
ততক্ষণে অঙ্গুলি কাটিয়া তারে দিল॥
সন্তোষ হইল তাহে বীর ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন জানিলা গুরু আমারে সদয়।।
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুই জনে।
প্রশংসা করিয়া গৃহে করিলা গমনে।।
(পৃ. ১১৯)

অনেকেই মনে করেন *মহাভারত* বলতে একটিই বই বোঝায়, লিপিকরের দোষে দু-চারটি ভুল থাকলেও ব্যাপারটা মোটের ওপর একই। আশাকরি

তাঁরা বুঝবেন ঘটনা তেমন নয়। কাশীদাসী *মহাভারত*-এর বিভিন্ন সংস্করণেও পাঠান্তর থাকে। যেমন, দেব সাহিত্য কুটির সংস্করণে একলব্য-এর উপাখ্যানকে আলাদা একটি অধ্যায় করা হয়েছে। তার পাঠ তারাচাঁদ দাস সংস্করণের সঙ্গে অনেকটাই মেলে। সেখানেও আছে:

দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল।।

এখানে 'হেন' আর 'যবে'র যা তফাত, সেটি গৌণ। দ্রোণ-অর্জুন সংবাদ কিন্তু খানিকটা আলাদা:

বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন।
আমারে বঞ্চনা কেন কৈলা ভগবন্।।
পূর্ব্বেতে আমার কাছে কৈলা অঙ্গীকার
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার।।
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে।।
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদকুমারে।।

(পৃ. ১২১)

এই পাঠ রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় সংস্করণের সঙ্গে যতটা মেলে, তারাচাঁদ দাস সংস্করণের সঙ্গে ততটা নয়। দেব সাহিত্য কুটির সংস্করণের শেষেও একলব্যকে তারিফ করা হয়:

তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিলা গমন।।

(পৃ.১২২)

তাহলে সংস্কৃত *মহাভারত*-এর সঙ্গে কাশীদাসী *মহাভারত*-এর তফাত হলো কীসে? এক এক করে বিষয়টি দেখা যাক।

১) দ্রোণ যে একলব্যকে ফিরিয়ে দিলেন তার কারণ হিসেবে একলব্যর নিষাদ-সন্তান হওয়াকে বড় করে দেখানো হয়েছে, আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে নয়। আবার দ্রোণের এই প্রত্যাখ্যান যে নিষ্ঠুরতার পরিচয়--- কাশীদাসী *মহাভারত*-এ সেটি পরিষ্কার করে বলা থাকে।

২) একলব্যর গুরুদক্ষিণাকে (নিজের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া) দ্রোণ ও

অর্জুন দুজনেই সুখ্যাতি করেন কাশীদাসী *মহাভারত*-এ। সংস্কৃত *মহাভারত*-এ সেই সুখ্যাতির কথা নেই।

মনে হয়, সংস্কৃত *মহাভারত*কার একলব্য উপাখ্যানে সমালোচনার যোগ্য কিছু খুঁজে পান নি। দ্রোণের প্রত্যাখ্যান ও অর্জুনের ঈর্ষা--- কোনোটিকেই তাঁর নিন্দনীয় বলে মনে হয় নি; স্রেফ ঘটনা হিসেবে পুরো উপাখ্যানটি রচনা করেছেন। এর কোথাও মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে নি। বরং পরোক্ষে একটি বিষয়ের ইঙ্গিত থাকে: গুরু ছাড়া কোনো শিক্ষা--- সে চতুর্বেদই হোক আর ধনুর্বেদই হোক--- সফল হয় না। রীতিমতো ব্রহ্মচারী সেজে, মাটি দিয়ে দ্রোণের মূর্তি গড়ে একলব্যকে ধনুর্বিদ্যা রপ্ত করতে হয়। একা নিজের উদ্যোগে ও চেষ্টায় তিনি তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব যেন কিছুতেই অর্জন করতে পারতেন না।

কে গুরু হতে পারেন? তারও পরোক্ষ উত্তর একলব্য উপাখ্যানে আছে। দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছাড়া আর কেউ বেদশিক্ষা বা শিক্ষণের অধিকারী নন। এমনকি সে-বেদ যদি ধনুর্বেদও হয়, তাহলেও না। অস্ত্রশিক্ষা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যর জাতিগত কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এটি একান্তভাবেই ক্ষত্রিয়ের কাজ। জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়েও দ্রোণ কিন্তু ক্ষত্রিয়র শিক্ষণীয় বিষয়টি ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন। গোড়ায় তাতে কোনো ফল হয় নি। ছেলেকে গরুর দুধ খাওয়ানোর মতো সামর্থ্য তাঁর ছিল না। বিরাট দেশের রাজা দ্রুপদ ছোটোবেলায় দ্রোণের সঙ্গে খেলা করতেন, তাঁকে সখা বলে জানতেন। রাজা হওয়ার পর কিন্তু ধন গরিমায় গর্বিত হয়ে তিনি সেই গরিব ব্রাহ্মণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চান নি।

দ্রোণের জন্ম খুব স্বাভাবিক নয়; যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁর জন্মও অস্বাভাবিক। প্রথম জীবনে কোনো সুখের মুখ তিনি দেখেন নি। মাথার চুল পেকে যাওয়ার পর ভীষ্মর দয়ায় তিনি জীবনে প্রথম স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেলেন।

বাস্তবে-অবাস্তবে মেলানো *মহাভারত*-এর গল্প ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পারস্পরিক সম্পর্কর কিছু গোপন জায়গা তুলে ধরে। কিন্তু সেটি আসল কথা নয়। একলব্য উপাখ্যানে দেখা যায়: ভীষ্মর কাছ থেকে ধন-ঐশ্বর্য পেয়ে দ্রোণের সাধ মেটে নি। কুরু-পাণ্ডব ছাড়াও অন্যান্য দেশের রাজকুমারদের আচার্য হয়ে তিনি আরও ধন পেতে চাইলেন। এই স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে আবার ধর্মবুদ্ধিও কাজ করেছিল। 'ধর্মজ্ঞ' বলেই তিনি ঠিক করেছিলেন: নিষাদের ছেলেকে--- যদিও সে রাজপুত্র--- শিষ্য করা ঠিক হবে না। তাতে ক্ষত্রিয় সন্তানদের গুরু

হতে অসুবিধে হবে।

*মহাভারত*কারের কাছে এইগুলিই ছিল শেষ কথা। সূতপুত্র কর্ণকে শিষ্য হিসেবে নিতে আপত্তি নেই, কিন্তু একলব্যকে ফিরিয়ে দেওয়া--- এর মধ্যে তিনি অন্যায় কিছু দেখেন নি। তেমনি, তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে দ্রোণ যে কথা দিয়েছিলেন, সেটি রাখার জন্য গুরুদক্ষিণা বাবদ একলব্যর কাছ থেকে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল চাইতেও তাঁর কোনো কুণ্ঠা নেই। এক মুহূর্তেই তিনি সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; যাকে তিনি কিছুই শেখান নি--- গুরু বলে নিজেকে দাবি করার কোনো অধিকারই তাঁর ছিল না--- তার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা চাওয়ায় ঐ 'ধর্মজ্ঞ' অন্যায় কিছু দেখেন না। *মহাভারত*কারও এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পান নি। বিনা মন্তব্যেই তিনি ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেছেন। উল্‌টে বলা যায়, অর্জুনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্রোণ রাখলেন— এটিকেই তাঁর চরিত্রর ইতিবাচক দিক বলে মনে হয়েছিল সংস্কৃত *মহাভারত*কারের।

তার কয়েকশ বছর বাদে কাশীরাম দাস কিন্তু অমন নির্বিকার থাকতে পারেন নি। তাই দ্রোণ সম্পর্কে তো বটেই, অর্জুন সম্পর্কেও কিছু বিরূপতা তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। যত সংক্ষেপেই হোক, সেই মনোভাব ধরা পড়েছে।

একলব্যর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে *মহাভারত*-এ বিশেষ কিছু বলা নেই। সংস্কৃত *মহাভারত*-এর দু-জায়গায় বলা হয়েছে, কৃষ্ণর হাতে একলব্য মারা পড়েন। দ্রোণ পর্বে দেখা যায় কৃষ্ণ বড়াই করে অর্জুনকে বলছেন: আমি তোমার মঙ্গলের জন্য একলব্যকে মারিয়েছি। (প্রামাণিক সংস্করণ, ১৫৬।১৯; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ ১৫৫।৫২; কালীপ্রসন্ন সিংহ অধ্যায় ১৮২; বর্ধমান রাজবাড়ি অধ্যায় ১৮১)।

কৃষ্ণর মৃত্যুর পর অর্জুন বসুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বিলাপ করে বসুদেব বললেন: যে-কৃষ্ণ ছিলেন জগতের প্রভু, যিনি কেশী, কংস ও চেদীরাজ (শিশুপাল), নিষাদরাজ একলব্য প্রমুখকে বিনাশ করেছিলেন, তিনি বংশনাশের বিষয়টিকে উপেক্ষা করলেন! (মৌষলপর্ব, প্রামাণিক সংস্করণ ৭।১০); কিন্তু কবে কোথায় কৃষ্ণ তাঁকে মারলেন, তা কোথাও বলা নেই। আর সেই কারণেই এস. সোরেনসেন ঘটনাটি সম্পর্কে সন্দিহান (পৃ. ২৮৫)। *হরিবংশ* - হরিবংশ পর্ব, অধ্যায় ৯১ (প্রচলিত সংস্করণ) থেকে জানা যায় জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করলে একলব্য তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেন। কৃষ্ণর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তিনি।

*মহাভারত*কার আর কিছু না বললেও একটি খবর দিয়েছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞর ঘোড়া নিয়ে অর্জুন নিষাদ রাজ্যেও পৌঁছেছিলেন। একলব্যর ছেলে (তার নাম দেওয়া নেই। শুধু 'একলব্যসূত' বলা হয়েছে) সেই ঘোড়াকে আটকে দেন। অর্জুন তখন তাকে পরাস্ত করেন।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়র কাছে এ দুনিয়ার নিষাদদের হেরে চলাই যেন নিয়তি।

বাঙলা *মহাভারত*-এর কোনো সংস্করণেই অবশ্য একলব্যর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছু বলা নেই তবে, আগেই যেমন বলা হয়েছে, একলব্যর প্রতি দ্রোণ ও অর্জুনের আচরণকে একবারও ভালো চোখে দেখা হয় নি।

রচনাপঞ্জি

মহাভারত। মূল ও/ বা তার অনুবাদ।

প্রচলিত সংস্করণ। পঞ্চানন তর্করত্ন
সম্পা. বঙ্গবাসী, ১৮৩২ শক (নীলকণ্ঠ টীকা সমেত)।

--- প্রামাণিক সংস্করণ। বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর প্রমুখ সম্পা.। পুণা: ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৩৩-৩৬।

--- বর্ধমান রাজবাড়ী সং, ভারবি পুনর্মুদ্রণ।

--- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা. টীকা ও অনুবাদসমেত। বিশ্ববাণী পুনর্মুদ্রণ।

--- কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত। সাক্ষরতা প্রকাশন পুনর্মুদ্রণ।

--- সংস্কৃত *মহাভারত*-এর সারানুবাদ:
রাজশেখর বসু। এম.সি.সরকার, বহুবার পুনর্মুদ্রিত।

--- *কাশীদাসী মহাভারত*। তারাচাঁদ দাস এন্ড সন্স, তারিখ নেই।
দেবসাহিত্য কুটির, ১৯৮৫।
রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, ১৪১৪ ব.।

--- নামসূচি:

Sorensen, S. *An Index to the Names in the Mahabharata*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1963 (first pub. 1904).

--- *হরিবংশ*। প্রামাণিক সংস্করণ। পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য সম্পা.। পুণা ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৬৯।
বঙ্গবাসী সং. ১৮৭২ শক.।

আমার চেতনায় আম্বেদকর

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

... এবারের চেতনা লহর পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা যা মূলতঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর জীবন ও দলিত সমাজকে শিক্ষিত সচেতন সংগঠিত করবার তাঁর আপ্রাণ প্রয়াসের দলিলিকরণ হিসাবে প্রকাশিত করার ঐকান্তিক উদ্যোগ নিয়েছেন সম্পাদক মহোদয়– এমনটা বলাই চলে। যেহেতু আমি চেতনা লহর পত্রিকার নিয়মিত লেখক, আমাকেও বন্ধুবর অনন্ত আচার্য আদেশ করেছেন এই বিষয়ে কিছু লেখার। আমাকে দিয়ে এই বিষয়ে লেখানো! এ যেন ছাগল দিয়ে হাল চাষ করানোর বৃথা একটা চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। আমি জানি এই বিষয়ে লেখার জন্য আমার চেয়ে 'কোটি গুণে' উপযুক্ত আম্বেদকর-গবেষক চেতনা লহর পত্রিকায় লেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই বলে না, পাগলা ভাত খাবি? না, হাত ধোব কিসে? তা সত্ত্বেও আমাকে লিখতে বলা--- এতে কে জানে আমার এতকালে অর্জিত 'সুনাম'-এর উপর পোঁচড়া পড়ে যাবে কিনা! আমার এক বন্ধু একবার কবিত্ব করে বলেছিল, 'যদি না জ্বলজ্বল করো লোক হাসাতে সভায় যেও না'। যা এখন অবস্থা, এই বিষয়ে লিখতে যেসব বিদ্বান বিখ্যাত মানুষ এতকাল কলম ধরেছেন, জ্বলজ্বল তো দূরের কথা, তাদের সামনে যা একটু জ্বলছি তাতেও এক বালতি জল পড়ে যাবে।

আপনারা সবাই জানেন আমার লেখাপড়ার দৌড় কতখানি। এ দিয়ে হয়ত চেষ্টা চরিত্র করে কোনোমতে একটা আধটা গল্প-উপন্যাস লিখে ফেলা যেতে পারে কিন্তু প্রবন্ধ লেখা যায় না। প্রবন্ধ লিখতে হলে প্রচুর পড়তে হয়, যেভাবে বাগান থেকে মালি ফুল তোলে সেইভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হয় আর প্রত্যেকটা বই থেকে কিছু কিছু নিয়ে নিজের লেখায় সংযোজন করতে হয়। যে যত দক্ষতার সঙ্গে এটা করতে পারেন তিনি তত বড় প্রবন্ধকার। কোনো প্রবন্ধকার এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু আমার পক্ষে অসুবিধা একটা নয়, দুটো। এক তো হাজার সমস্যায় আজকাল আর আগের মত পড়বার সময় বের করে উঠতে পারছি না। কত মূল্যবান বই যে

গল্প উপন্যাস ছেড়ে আমি যদি প্রবন্ধ লিখি কেউ না কেউ লাঠিসোটা নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যারা সারাজীবন আম্বেদকর চর্চা করছেন, আম্বেদকর ছাড়া আর কোনোদিকে নজর ঘোরাবার সময় পাননি, তারা বলবেন, এটা আমার বই থেকে টুকলি করা। সব বলবেন কিন্তু এটা বলবেন না যে তার আগে আরও কয়েকশত জন এই বিষয়ে লিখে রেখে গেছেন আর তিনিও তাদের কারো লেখা থেকেই টুকলি করেছেন। এটা তার মৌলিক কিছু কাজ নয়। EPW-তে প্রকাশিত আমার একটা লেখা নিয়ে কী ভীষণ বিতর্ক শুরু হয়েছিল লেখাটি প্রকাশিত হবার বারো বছর পরে--- আপনাদের অনেকের তা আজও মনে আছে নিশ্চয়ই। ওটা নিয়ে এত বিতর্ক হতো না, যদি না লেখাটা ভারত তথা পৃথিবীর জনে জনে পড়ে প্রশংসায় এত পঞ্চমুখ হতো। কী কষ্ট বলুন দেখি। তারা এত শিক্ষিত, এতকাল ধরে কত দিস্তা দিস্তা লিখেছেন কিন্তু তাদের নাম পাড়ার পাঁচজন ছাড়া আর কেউ জানলো না। আর কোথাকার কোন এক অশিক্ষিত বর্বর রিকশাওয়ালা এসে বাজি মেরে বেরিয়ে গেল!

এই ভয়ে আমার আর প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করে না। চেতনা লহরে যা লিখেছি এতকাল তাকে প্রবন্ধ বলা যায় না। আর আজকাল আমি মোটেই তর্ক-বিতর্ক ঝগড়ায় যেতে চাই না। এতে ফালতু সময় নষ্ট। কিন্তু সম্পাদক যে নাছোড়। অগত্যা একটা প্রয়াস---।

আমি যতটা আম্বেদকর অনুরাগী তার চেয়ে নিজেকে অনেক বেশি মার্কসবাদী বলতে ভালোবাসি। অঙ্কের হিসাবে পঁচিশ আর পঁচাত্তর ভাগ। আমি মনে করি আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের যে মূল সমস্যা সেটা প্রধানতঃ খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থান-চিকিৎসার সমস্যা। অন্য যা কিছু, সব তার পরে। সব তার নিচে।

চাষি-মজুর এই মানুষদের আপনি ইচ্ছা করলে মার্ক্সের ভাষায় সর্বহারা বা হ্যাভ নটস বলতে পারেন। দেশের এইসব মানুষের সমস্যা সমাধানকল্পে মার্ক্সবাদের চেয়ে শক্তিশালী কোনো মতবাদ আর আমাদের সামনে নেই। যদি মার্ক্সবাদকে সামনে রেখে সঠিকভাবে লড়াই গড়ে তোলা যায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়।

বহুকাল ধরে বহু মানুষ সমাজের দুরবস্থা নিয়ে নানান মতামত দিয়েছেন --- দুঃখ প্রকাশ করেছেন, মোটা মোটা বই লিখেছেন, কিন্তু কোন পথে সমস্যার সমাধান সম্ভব তা বলতে পারেননি। মার্ক্স একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক মতাদর্শ দ্বারা কোন পথে সমাধান সম্ভব তার পথ নির্দেশ দিয়েছেন। পৃথিবীর

অনেক দেশ— রাশিয়া, চীন, কিউবা ভিয়েতনামে সেই মতবাদ দেশীয় পরিস্থিতি অনুসারে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন সাপেক্ষে প্রয়োগ করে মতাদর্শের শক্তি ও সত্যের প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছে, সাফল্য অর্জন করেছে।

ভাবতে পারেন কত ছোট আর কত দুর্বল একটা দেশ কিউবা, ভিয়েতনাম। কোন সাহস আর শক্তিতে তারা আমেরিকার মত শক্তিধর একটা দেশের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পেরেছিল? জয়লাভ করতে পেরেছিল? কীছুই ছিল না তাদের, ছিল একটা বিজ্ঞানভিত্তিক মতাদর্শ। সেটাই তাদের জয় ছিনিয়ে আনার প্রধান হাতিয়ার।

এটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা যে কিছু বছর পরে পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রে রাশিয়ায় সে সাফল্য ধরে রাখা যায়নি। সেই দেশের ব্যর্থতার উদাহরণ তুলে ধরে শোষকশ্রেণীর পক্ষের কিছু ধূর্তলোক এটা বলতে চাইবে যে আজকের উন্নত দুনিয়ায় আর মার্ক্সবাদের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। তারা আমাদের হতাশ নিরাশ নিরস্ত করার চেষ্টায় অনেকরকম উদাহরণ প্রস্তুত করবে। কিন্তু আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে--- যখন পৃথিবীতে মার্ক্সবাদ ছিল না, সেই স্পার্টাক্যুসের কাল--- তখনও মানুষ লড়তো মার্ক্সের জন্মের পরেও লড়ছে। অর্থাৎ মার্ক্স থাকুন আর না থাকুন যদি শোষণ শাসন অন্যায় অত্যাচার থাকে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়বেই। তাকে বাঁচার জন্য লড়তেই হবে। এছাড়া আর অন্য কোনও পথ নেই।

যখন মানুষের হাতে তীর-ধনুক ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ছিল না, বন্য আর হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আক্রমণের সময় সেই সাধারণ অস্ত্র চালিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। আজ যখন বন্দুক আবিষ্কৃত হয়েছে সেই তীর চালাবার কাল থেকে আত্মরক্ষা অনেক সহজতর হয়ে গেছে। তেমনই যখন মার্ক্সবাদ ছিল না যে যেভাবে পেরেছে--- মানুষ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আজ যদি সে মার্ক্সবাদের শিক্ষা গ্রহণ করে তার প্রদর্শিত পথে গণসংগ্রাম সংগঠিত করে, সেই 'মতাদর্শগত' উন্নত অস্ত্র সঙ্গে থাকায় বিজয়ের সম্ভাবনা নাগালে এসে যেতে পারে।

বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এখানে আমার আরও যা বলার তা হলো--- কোনো মানুষের যদি মারাত্মক কোনো অসুখ হয় আর কোনো ওষুধে রোগটা সেরে যায়, বলার অপেক্ষা রাখে না যে ওষুধটি যে কার্যকরী তা প্রমাণিত হয়েছে এবার পরবর্তীকালে কোনো ভুলে রোগী যদি সেই রোগে পুনঃআক্রান্ত হয়

সেটা ওষুধের দোষ নয়, দোষ অসাবধানতার। যা যা সাবধানতা অবলম্বন করলে রোগ পুনঃআক্রমণের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকা যেত সেই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি এটাই প্রমাণিত হয়। তাই পরবর্তী সময়ে সেই দিকে গভীর লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোগমুক্তির পরেও কোনোভাবে আবার কোনো ভুলে যেন আক্রান্ত না হতে হয়। বর্তমানে রাশিয়া আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে।

আমি যেটুকু জেনেছি-বুঝেছি তাতে আমার মনে হয়েছে--- মেহনতি মানুষের উপর জগদ্দল পাহাড়ের মত হাজার বছর ধরে চেপে বসে থাকা শোষণ-শাসনের অবসান করতে হলে, মার্ক্সবাদের চেয়ে উন্নত কোনো মতবাদ আজও পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি। তাই শোষিত-বঞ্চিত মানুষকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে মার্ক্সবাদের সহায়তা না নিয়ে অন্য কোনো উপায় নেই। যখন এর চাইতে উন্নত কার্যকর কোনো প্রমাণিত অস্ত্র নাগালে এসে যাবে তখন একে ত্যাগ করে দেওয়া যাবে। যতক্ষণ তা না পাওয়া যাবে একেই আঁকড়ে ধরে এগোতে হবে।

যারা ক্ষেতখামার খনিখাদান কলেকারখানায় কাজ করে তাদের জাতি বর্ণ খুঁজলে পাওয়া যায় এরা সব নিম্ন বর্ণ-সম্প্রদায়ের মানুষ। আপনি যাদের এখন সংখ্যালঘু বা মুসলিম বলছেন তারাও তাই। কারণ কোনো এক পর্বে এরা জমিদার আর ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারেই হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে ওই ধর্মের আশ্রয় খুঁজেছিল। আগে বৌদ্ধ তারপর মুসলমান--- সব অমানবিক ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্মম দমনপীড়নের ফল।

তাই ইচ্ছা করলে আপনি আম্বেদকর সাহেবের ভাষায় এদের দলিতও বলতে পারেন। যে নামেই ডাকুন তাদের সমস্যা সবার এক। এই সমস্যা যাদের দ্বারা সৃষ্ট তাদের চিহ্নিতকরণে উচ্চবর্ণ বলুন বা পুঁজিপতি, বলায় কোনো ভুল হবে না। দেখা যায় ভারতবর্ষের যে ৮০/৮৫ টি পরিবার বিত্তের সর্বোচ্চ শিখরে বসে আছে, আর দেশের মানুষকে শুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে একমাত্র টাটা বাদে সবাই সেই উচ্চবর্ণের মানুষ। আর শত্রু যখন এক, লড়াইও করতে হবে একসাথে। সেই লড়াইকে আপনি শ্রেণি সংগ্রাম বলেন বা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন বলেন এতে কোনো ফারাক হবে না।

যেহেতু উচ্চবর্ণ মানুষ চতুরতায়, শিক্ষায়, রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে আর ইতিহাস চেতনায় বহুকাল ধরে এগিয়ে রয়েছে তাই সব দলের শীর্ষে তারাই উঠে বসতে পারে। মার্ক্সবাদী দলেও এর অন্যথা হবার নয়। মূলতঃ

যে উচ্চমধ্যবিত্ত আর উচ্চবর্ণ মানুষের মধ্যে থেকে নেতৃত্বে আরোহণ করবে তারা সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনায় যতটা তাত্ত্বিকভাবে দুঃখিত, মানবিক ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে তা নয়। তখনও তাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে পুরাতন ধ্যানধারণার অবশেষ। ফল এটা দেখা গেছে যে নেতা মাঠে ময়দানে জনসাধারণের জন্য গলাবাজি করছেন, জাতপাত বর্ণবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ভাষণে আগুন ছোটাচ্ছেন তিনি তার নিজের বাড়িতে ঢোকামাত্র এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে নিচ্ছেন। বাড়ির অন্দরমহলে চলছে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী-পুঁজিবাদী সংস্কৃতি। সেখানে মন্দিরে বিরাজমান শতেক রকম দেবতা। আর বাড়ির যে কাজের মেয়েটি, ড্রাইভার, মালি, দারোয়ান সে যদি মে দিবসের ছুটি চায়, যদি আটঘন্টা কাজের দাবি করে, যদি সামান্য মাইনে বাড়াবার চাপ দেয়, তখনই তাদের বুকের ভেতরের গোপন পুঁজিবাদী ভাবনা ছলকে ছলকে বাইরে বের হয়ে আসবে। এটা প্রমাণিত সত্য। যে কোনো শ্রমজীবী মানুষ এই সত্য জানেন।

যেহেতু দেশের পঁচাশি শতাংশ মানুষ নিম্নবর্ণের— কলকারাখানায় ক্ষেতখ ামারে তাদেরই শ্রমঘামে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল থাকে তাই সব নেতৃত্ব-কর্তৃত্বে পঁচাশি শতাংশ নিম্নবর্ণের মানুষই থাকবে। বাকি যে পনেরো শতাংশ আসন তা বুদ্ধিজীবী বিদ্বান এমনকি দরদী বিত্তবান কেউ থাকলে তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। ঐ পঁচাশি শতাংশ যে মানুষ তার মধ্যে স্থান পাবে শ্রমিক কৃষক মহিলা, বৃহন্নলা, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সমস্ত ধরনের সচেতন সংগ্রামী মানুষ। আমার বলার কথা এটাই যে সংগঠনের 'আত্মা' থাকবে মার্ক্সবাদী আর দেহ কাঠামোটি গঠন করতে হবে রামস্বামী পেরিয়ার, জ্যোতিবা ফুলে আর আঙ্গ স্বেদকরকে মাথায় রেখে।

আমি আগেও অনেকবার বলেছি, আপনারা যদি দণ্ডকারণ্যের বস্তার তথা অবুঝমাড় অঞ্চলে যান আর সেখানকার আদিবাসী মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে দেখবেন তারা দিল্লি কোথায় জানে না, ভূপাল কোথায় খবর রাখে না, রেলগাড়ি কেমন চোখে দেখেনি, মোবাইল কাকে বলে জানে না। কোথায় যে চিন আর কে যে মাও কিছুই জানবার অবকাশ পায়নি। কিন্তু তারা লড়ছে, যাকে অনেকে বলছে রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলের বিপ্লবী লড়াই। আপনি আমি তাদের সেই লড়াইকে সমর্থন করতে পারি আবার নাও করতে পারি কিন্তু তাদের সেই সাহসী সংগ্রামকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। মার্ক্সবাদ মাওবাদ কিছুই না জেনে তারা লড়ছে কারণ না লড়ে কোনো পথ খোলা নেই। যেখানে শিক্ষিত

তাত্ত্বিক নেতা পিছিয়ে আসছে, তারা দুর্মর সাহসে এগিয়ে যাচ্ছে। বস্তারে প্রতিবছর যত মানুষ না খেয়ে মারা যায়, যত মানুষ সামান্য পানীয় জলের অভাবে আমাশয় আন্ত্রিকে মারা যায়, তারচেয়ে অনেক কম পরিমাণ মানুষ মরে পুলিশের গুলিতে। জনগণনায়দেখা যায় সারা দেশে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বস্তার, দণ্ডকারণ্যে কমছে।

যারা চান ভারতবর্ষ বর্ণবাদ ও পুঁজিবাদী নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পাক, তাদের এদেশে মার্ক্স ও আম্বেদকর মতবাদের একটা সমন্বয় সাধন করে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শুধু মার্ক্সবাদ যেমন পারেনি, শুধু আম্বেদকর মতবাদও পারবে না। যেমন বামপন্থী দলের শীর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী উঠে বসে যাবে তেমন খালি আম্বেদকরবাদী দল হলে তার শীর্ষে কোনো পুঁজিবাদী প্রভু উঠে বসে পড়বে। এরা উভয়েই একটা পর্যায়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সমস্যার সমাধান হতে দেবে না--- সমস্যা জিইয়ে রেখে নিজস্বার্থের রুটি সেঁকবে।

এখানে একটা কথা অবধারিতভাবেই এসে যায়--- বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যিনি দলিত মানুষের সমাজ থেকে এসেছেন এবং একান্তভাবেই দলিত মানুষের জন্য সারাজীবন ব্যয় করেছেন তিনি কি জানতেন না মার্ক্সবাদ কী? তাহলে কেন তিনি মার্ক্সীয় মতবাদ বা শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রেণিসংগ্রাম করলেন না? কেন একটা বহু পুরাতন, ধর্মীয় কন্দরে আশ্রয় নিলেন? তিনি কি বুঝতে পারেননি যে ব্রাহ্মণ্যবাদ আজ বৌদ্ধধর্মকেও গিলে নিয়েছে! বুদ্ধকে দশ অবতারের এক অবতার আর বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের একটা শাখায় পরিণত করে ফেলেছে!

পুঁজিবাদ হচ্ছে ছলে বলে কৌশলে অপরের শ্রমকে আত্মসাৎ করে নেওয়া মতবাদ আর পুঁজিবাদের উচ্চতম রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। ঐ মতবাদের একটা খন্ডিত রূপ হল ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা মনুবাদ। ধর্মকে সবসময় শোষক আর শাসক শ্রেণি কৌশলে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে নেয়। বৌদ্ধ ধর্মের বাড়বাড়ন্ত তখনই সম্ভব হয়েছে যখন রাজারা একে গ্রহণ করেছেন। যে সময়ে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন সেইসময় ঐ ধর্ম তার সমস্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতা, প্রতিবাদী চরিত্র নষ্ট করে ফেলে একটা আচারসর্বস্ব ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মহাযান, বজ্রযান আর হীনযান তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই ধর্ম দ্বারা মনুবাদীদের আর ভয় পাবার মত অবশিষ্ট কিছু নাই। তবু তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন কারণ শ্রেণিবঞ্চনার চাইতে তাকে অধিক পীড়িত করেছে হিন্দুত্ববাদী ব্যবস্থা।

এমনটা অনেকের অভিমত যে আম্বেদকর হিন্দুধর্ম থেকে চলে যেতে চাননি। চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে কিছু সংস্কার। সেটা সম্পন্ন হলে আর উনি হয়ত ধর্ম পরিবর্তন করতেন না। যে কথার সমর্থন পাওয়া যা ওনার কিছু লেখায়-কথায়। ১৯৩৫ সালে জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের যে সভায় উনি সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সভাপতির ভাষণ হিসাবে যে বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলেন তাতে যে দাবীগুলো হিন্দুর মধ্যেকার উদারপন্থী ও সংস্কারপন্থীদের কাছে করেছিলেন সেগুলোয় একবার চোখ ফেরালে তার মনোভাবের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে:

(১) হিন্দু ধর্মের জন্য একটি এবং কেবলমাত্র একটি মান্য গ্রন্থ থাকবে যা সমস্ত হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং স্বীকৃত হবে। এর মানে, অবশ্যই হিন্দুদের বাকী ধর্মীয় গ্রন্থগুলি, যেমন বেদ, শাস্ত্র, এবং পুরাণ যেগুলিকে পবিত্র এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক বলে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং ঐ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর নিহিত কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক মতবাদের পক্ষে প্রচার চালানোকে আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করতে হবে। (২) এটা ভাল হবে যদি হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিতগিরির অবসান ঘটানো যায়। কিন্তু যেহেতু এটা করা অসম্ভব তাই পৌরোহিত্যকে অবশ্যই বংশগত পেশা থেকে মুক্ত করতে হবে। যিনি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেন এমন ব্যক্তিমাত্রেই একজন পুরোহিত হবার যোগ্য। আইনত কোনো হিন্দুই একজন পুরোহিত হিসাবে বিবেচিত হবেন না যদি না তিনি রাষ্ট্রের দ্বারা নির্ধারিত একটি পরীক্ষা পাশ করেন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি সনদ লাভ করেন। (৩) যার সনদ নেই এমন কোনো পুরোহিত দ্বারা আচরিত অনুষ্ঠানকে আইনত বাতিল বলে গণ্য করতে হবে এবং সেই ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া হবে। (৪) একজন পুরোহিত হবেন রাষ্ট্রের সেবক। এ দেশের অন্যান্য নাগরিকরা যেমন দেশের সাধারণ আইনের অধীন তেমনই একজন পুরোহিত এবং তার নৈতিকতা, বিশ্বাস, পূর্জাচনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও রাষ্ট্রের সাধারণ আইন মোতাবেক ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় আনতে হবে। (৫) রাষ্ট্রের প্রয়োজনের ভিত্তিতে আইন করে পুরোহিতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে।

ঐ বক্তব্যে তিনি এও লিখেছিলেন— 'ব্রাহ্মণ্যবাদ এমন এক বিষ যা হিন্দুদের শেষ করে দিয়েছে'। উদারপন্থীদের কাছে আবেদন করে লিখেছিলেন তিনি, 'হিন্দুত্বকে আপনারা রক্ষা করতে পারবেন যদি ব্রাহ্মণ্যবাদকে ধ্বংস করতে সক্ষম হন। এই সংস্কারের কোনোদিক থেকেই (আপনাদের) আর কোনো

বিরোধিতা থাকা উচিত নয়। ... হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তাদের ধর্ম এবং নৈতিকতাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে'।

এটা আলাদা কথা যে ১৯৩৫ সালে জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের লাহোরে যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে আম্বেদকরকে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই লিখিত বক্তব্য তাদের মনোমত না হওয়ায় কিছু পরিবর্তন পরিমার্জনের কথা বলায় ড. আম্বেদকর তাতে রাজি হননি এবং উনি সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে অস্বীকার করেন। ফলে সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন যদি হিন্দু উদারপন্থীরা ড. আম্বেদকরের দাবি মেনে ধর্মসংস্কারে উদ্যোগী হতো, উনি কি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতেন? ড. আম্বেদকর আর কিছু নয়, মাত্র হিন্দুধর্মের ঘৃণিত বর্ণবাদের উপর বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন তাই তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়েছিলেন।

সেই সময়কালে আর এক ধূর্ত রাজনীতিবিদ গুজরাটি বেনিয়া 'গান্ধী'র কাছে আম্বেদকরের মনোভাব অজানা ছিল না। তাই তিনি হরিজন পত্রিকায় আম্বেদকর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন— 'ড. আম্বেদকর হিন্দুধর্মের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ এবং হিন্দু পরিমণ্ডলে শিক্ষালাভ করেও তিনি এই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন কারণ তথাকথিত সাবর্ণ হিন্দুদের কাছ থেকে তিনি ও তাঁর সমগোত্রীয়রা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার পেয়েছিলেন। সেই তিক্ততা থেকে তিনি শুধু তাঁদেরই নয়, সেই ধর্মকেও ত্যাগ করতে চেয়েছেন যে ধর্ম তাঁর নিজের ও সাবর্ণ সাধারণেরও উত্তরাধিকার। ধর্মীয় প্রচারকদের একাংশের বিরুদ্ধে তাঁর মনের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তিনি শেষপর্যন্ত সেই ধর্মের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করেছেন'।

আম্বেদকর দুঃখিত ছিলেন হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ ভেদভাবজনিত কারণে। তাই তিনি বলেছেন— জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের নষ্ট করেছে, ... স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের নিরিখে ধর্মীয় ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের সংস্কার প্রয়োজন। ড. আম্বেদকরের সেই বিখ্যাত বই— *অ্যানিহিলেশন অব কাস্ট*-এর আর এক জায়গায় আছে—'এমন একটা সময় এসেছে যে হিন্দু সমাজের নৈতিক পরিমার্জন এবং পরিশোধন একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ... হিন্দু সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে যদি চতুর্বর্ণ প্রথার অঙ্গ হিসাবে যে অস্পৃশ্যতা রয়েছে তাকে নির্মূল না করা যায়'। যদি সে সময় হিন্দুর উদারপন্থীরা হিন্দুধর্মে কিছু সংস্কারসাধন করতে সম্মত হতো তাহলে উনি হিন্দু থাকতেন না বৌদ্ধ হতেন কিছুই বলা যায় না।

একই সময়ের দুজন রাজনীতিবিদ— একজন গান্ধী আর একজন আম্বেদকর। প্রথমজন চেয়েছিলেন যে কোনো শর্তে ইংরেজের কাছ থেকে রাজক্ষমতা অধিগ্রহণ। অন্যজন চেয়েছিলেন যে কোনো ভাবে সামাজিক ভেদভাব থেকে মুক্তি। মজার ব্যাপার এটাই যে ১৯৩৫ সালে জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের জন্য লিখিত ভাষণে উনি বলেছিলেন, ''হিন্দু হিসাবে এটাই আমার শেষ বক্তৃতা'', কিন্তু উনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন ১৯৫৬ সালে। দীর্ঘ কুড়ি বছরকাল অপেক্ষা করার কারণ কী? তবে কি উনি হিন্দুদের মানসিক পরিবর্তন হতে পারে এমন কোনো আশায় বুক বেঁধেছিলেন? সেটা না হওয়ায় নিরাশ হয়ে মৃত্যুর মাত্র দুমাস আগে ঐ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন!

একটা অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই, যে বুদ্ধ তার অনুগামীদের ভিক্ষু বলতেন, নিজেও তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথের ধূলায় নেমে এসেছিলেন তার অনুগামীরা কিন্তু সেই মানসিকতার হতে পারেনি, হতে চায়ওনি। বড় বড় ধনাঢ্য বৌদ্ধ ব্যক্তিবর্গের গৃহে অষ্টব্যঞ্জন ভোজন আর দিনান্তে কিছু জপতপ এই নিয়েই মত্ত হয়ে পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক চিন যেখানে এক বৌদ্ধ লামা নিজস্ব কিছু ধার্মিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে চেয়েছিল। সরকার বাধা দেয়। ফলে তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। অবাক কাণ্ড এই যে সে যখন পালায় চল্লিশটা গাধা লেগেছিল তার সোনাদানা হীরাজহরত বহন করার জন্য! এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকের দলপতির এত সম্পদ ভাবা যায়? এতেই অনুমান করা যায় সে সমাজতান্ত্রিক চিনের শাসকদের রোষে কেন পড়েছিল! ভারতবর্ষে নিরীহ বোকাহাবা মানুষের মেহনতের কামাই চুষে রামরহিম, আশারাম বাপু, সাইবাবা, হতে কোনো বাধা নেই কিন্তু জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ যে সরকার সে সেটা হতে দেবে কেন?

যে সময় বাবাসাহেব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন তখন হয়ত তিনি খানিক রাগে দুঃখে হতাশায় ঐ ধর্ম নিয়েছিলেন। কারণ তিনি পূর্বেই ঘোষণা করে রেখেছিলেন,'হিন্দু হয়ে জন্মেছি, হিন্দু হয়ে মরব না'। শারীরিক অবস্থা তার সে সময় ভালো যাচ্ছিল না। বুঝেছিলেন ধীরে ধীরে সময় ফুরিয়ে আসছে। ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর নাগপুর শহরে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন আর তার মাত্র দু'মাস পরেই ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর দিল্লির বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়।

উনি ১৯৩৬ সালে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন, যার পতাকার রঙ ছিল লাল। যে দল শ্রমিক কৃষক মেহনতি

মানুষের ঐক্য গড়ে পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে একসময় উনি বম্বের সুতাকল শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ের লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। ৫ মে ১৮১৮ কার্ল মার্ক্সের জন্ম। মৃত্যু ১৪ মার্চ ১৮৮৩। ১৯১৭ সালে সেই দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের লড়াই হয়ে গেছে। স্থাপিত হয়েছে একটা নতুন ধরনের সমাজব্যবস্থা। একসময় উনি গর্ব করে বলেছেন যে মার্ক্সবাদী অনেক নেতার চেয়ে তিনি অনেক বেশি মার্ক্সবাদী দর্শনের বই পড়েছেন। তবুও উনি সেই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন না কেন?

অনেকে বলে থাকেন যে মার্ক্সবাদীরা হিংসায় বিশ্বাসী বলে উনি ঐ মতবাদ অপছন্দ করতেন। কিন্তু আমরা যদি চৌদার পুকুর অভিযানের সময় ওনার বক্তব্য দেখি, দেখতে পাবো উনি একেবারে অহিংস ছিলেন না। দলিত উত্থান-আন্দোলন বিষয়ে বলেছিলেন তিনি, 'কেউ অস্বীকার করবেন না যে এই বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ সংঘটনের দায়িত্ব অনেকটাই আমাদের চেয়ে আঙ্গ মাদের বিরোধী পক্ষের উপর নির্ভর করছে। সামাজিক বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হবে না হিংসাত্মক হয়ে উঠবে তা পুরোপুরি নির্ভর করছে বর্ণহিন্দুদের ব্যবহারের উপর'। মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে ১৯৫৪ সালের ২৮ অক্টোবর বোম্বাইয়ে পুরন্দর স্টেডিয়ামে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: 'যেখানে ইচ্ছা অন্যদের যেতে দাও। আমরা জ্যোতিবার পথ অনুসরণ করব। আমরা মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করতে পারি, না-ও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু জ্যোতিবার দর্শন আমরা ছাড়ব না'। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ একেবারে অচ্ছ্যুৎ একথা তিনি কখনই বলেননি। প্রয়োজন বোধে তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে এরকমই ভাবতেন।

আজকে আমাদের বক্তব্যও তাই— আমরা মার্ক্সবাদ যেমন ছাড়ব না আবার আম্বেদকর মতবাদও ছাড়তে পারব না। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষকে দুই হাতে এই দুই অস্ত্র নিয়ে এগোতে হবে। এটা সময়ের দাবি, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার জন্য জরুরি। বাবাসাহেব সামাজিক পরিবর্তনের উপর অত্যধিক জোর দিয়েছিলেন, আর মার্ক্সবাদীরা জোর দিয়েছিল অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপর। আজকের সময়ে একসঙ্গে এই দুই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

দলিত সমাজের কিছু মানুষ যাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে সম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। যেহেতু বাবাসাহেব আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা দলিত সমাজের

মানুষকে সেই ধর্মের আওতায় নিয়ে যাবার জন্য প্রয়াস করে চলেছেন। যাদের খাদ্যবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে মাত্র সম্মান নাগালে আসেনি তারা বৌদ্ধ হতে পারেন বটে, তবে তাতে কতটা সম্মান ফিরবে সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন। পূর্বে যাঁরা দলিত সমাজ থেকে বৌদ্ধ হয়েছেন তারা কি সম সম্মান পাবার অধিকারী হতে পেরেছেন? খাদ্যবস্ত্র সমস্যার সমাধান হয়েছে? যদি প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়, তবে আপামর দলিত দরিদ্র মানুষকে ধর্ম পরিবর্তন নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য ঝাঁপাতে হবে। সেই লড়াই পরিচালনার জন্য মার্ক্স আর আম্বেদকর দুজনকেই দরকার।

সহায়ক পুস্তক:
১. সংবর্তক, বিশেষ বইমেলা সংখ্যা ২০১৭
২. মার্ক্সের ক্যাপিটাল, লেখক সুপ্রকাশ রায়।
৩. চেতনা লহর - পত্রিকা

আম্বেদকর, তুমি কার?
দেবী চ্যাটার্জী

সাম্প্রতিক সময়ে 'আম্বেদকর, তুমি কার?' এই প্রশ্নটি মনকে বেশ পীড়া দেয়; বিচলিত করে। অথচ প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। আজ রাজনীতি ও চিন্তার জগতে বিপরীত মেরুর মানুষরা আম্বেদকরকে তাঁদের বলে দাবি করছেন। নিজেদের আম্বেদকরের চিন্তাধারার সমর্থক বলে প্রচার করছেন। এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের আরো দুটি প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তা করতে হয়। প্রথম প্রশ্ন, আম্বেদকর প্রসঙ্গে ভারতের মূল ধারার সমাজের অবস্থান সময়ের সাথে সাথে কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আম্বেদকরের চিন্তার মূল স্তম্ভগুলি কী? এই প্রশ্নগুলির উত্তরই আমাদের মূল প্রশ্ন 'আম্বেদকর, তুমি কার' তার উত্তরের সন্ধানের ইঙ্গিত দেবে।

প্রথম প্রশ্নটিকে ধরা যাক, অথাৎ আম্বেদকর প্রসঙ্গে ভারতের মূল ধারার সমাজের অবস্থানের বিবর্তনের কাহিনী। প্রশ্নটির থেকেই বোঝা যায়, লেখকের বিশ্লেষণে সময়ের সাথে সাথে মূল ধারার সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আম্বেদকরকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে, যেমন এসেছে আম্বেদকরকে গ্রহণ না করা ও করার মধ্যে।

ব্যক্তি আম্বেদকরের জন্ম ১৮৯১ সালে। তখন তিনি আম্বেদকর নন, শুধুই ভীমরাও, অস্পৃশ্য মাহার পরিবারের রামজী শক্‌পালের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে অন্যতম। জন্মস্থান ইন্দোরের কাছে মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স অফ ওয়ার সংক্ষেপে যার নাম MHOW। আর পাঁচজন অস্পৃশ্য বালকের মতই তাঁর বেড়ে ওঠা--- অন্যায়, অত্যাচার, অসম্মানের মধ্য দিয়ে। সে আচরণের মধ্যে সামাজিকভাবে প্রান্তিকীকরণের সমস্ত উপাদান লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান। তাচ্ছিল্যের কারণ জাতি।

তবু সবকিছুর মধ্যে আলোর রেখা দেখা যায়। তাঁরই স্কুলের এক শিক্ষক বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রটিকে নিজের বর্ণহিন্দু পরিচয়, তাঁর পদবী দেন। তাঁর সে পদবী

ছিল আম্বেদেকর। সেই থেকেই ভীমরাও হন ভীমরাও আম্বেদকর। সামাজিক বঞ্চনা সত্ত্বেও ক্রমেই আম্বেদকর তাঁর মেধার পরিচয় দেন। আরো একটি আলোর শিখা দেখা দেয়। তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও। দেশেবিদেশে ধাপে ধাপে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের ইতিহাস রচিত হতে থাকে। তার পাশাপাশি তাঁর নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিপুল পঠনপাঠন থেকে জেগে ওঠা তাঁর সামাজিক চেতনার এক অন্য স্তর। ভারতের অসংখ্য অবদমিত জাতির মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে তিনি এগিয়ে আসেন।

১৯১৯-এ আম্বেদকরের ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রভূমিতে প্রবেশ-ফ্র্যাঞ্চাইস্ কমিটি বা সাউথবরো কমিটির সামনে তার প্রতিবেদনের মাধ্যমে। সেখানে অবদমিত জাতির মানুষদের দাবি তিনি তুলে ধরেন। সময়কালটা ছিল জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তারের সময়। তার নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষে গান্ধী। মূল ধারার এই রাজনীতিতে সামাজিক আন্দোলন ছিল ব্রাত্য। যেটুকু ছিল তা ছিল অতি সামান্যই, প্রান্তিক ক্ষেত্রে। বলাবাহুল্য স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার সেই লড়াই-এর নেতৃত্বে বর্ণ হিন্দু প্রাধান্য ছিল। অবদমিত জাতির মানুষদের সমস্যা ছিল গুরুত্বহীন। আম্বেদকরের ধারাবাহিকভাবে এই মানুষদের দাবিদাওয়া নিয়ে এগিয়ে চলাকে তাঁর সুনজরে দেখেননি। তাঁরা আম্বেদকরের পথকে ভুল পথ হিসাবে চিহ্নিত করায় তৎপর হন। ১৯৩০-৩২-এ লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোল টেবিল বৈঠকের প্রেক্ষিতে আম্বেদকরকে একঘরে করার প্রচেষ্টা চরম আকার ধারণ করে। অবদমিত জাতি তথা ডিপ্রেস্ড্ ক্লাসেসদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলির আম্বেদকরের দাবি ব্রিটিশ সরকার মানতে রাজি থাকলেও গান্ধী তাঁর চূড়ান্ত বিরোধিতায় আমরণ অনশন শুরু করেন। আম্বেদকরকে প্রায় বাধ্য করা হয় পুণা চুক্তির মাধ্যমে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করতে।

মূল স্রোতের রাজনৈতিক-সামাজিক শক্তিগুলি আম্বেদকরকে নানা দিক থেকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও আম্বেদকর গণপরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত হন। সংবিধান রচনার জন্য যে খসড়া কমিটি গঠিত হয় তিনি তার সভাপতি নিযুক্ত হন। তবে সেখানেও পদে পদে তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও, সাংবিধানিক যে দলিল তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন তা রচনা করতে না পারায় তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। হতাশ আম্বেদকরের নিজস্ব

চিন্তাভাবনা প্রকাশ পায় তাঁর States and Minorities প্রবন্ধে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্যপদ পেয়েও বর্ণ হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল চাপের মুখে দাঁড়িয়ে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের পরিকল্পনা মাফিক আইনসভায় হিন্দু কোড্ বিল পাস করাতে ব্যর্থ হন। ক্ষুব্ধ আম্বেদকর ১৯৫১-য় মন্ত্রীসভা থেকে সরে দাঁড়ান।

বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আম্বেদকর তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টতই বুঝতে পারেন মূল ধারার কংগ্রেসী রাজনীতি অবদমিত জাতিদের নয়, বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় ব্রতী। গান্ধির সামাজিক অবস্থান নিতান্তই ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর নিম্ন জাতিদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের লড়াই, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আন্দোলন, 'হরিজন' চিহ্নিত করে অস্পৃশ্য মানুষদের পাশে দাঁড়ানো সবই ছিল বড় ঠুনকো--- তা সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিতবহ নয়। আদতে গান্ধী জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে বর্জন করতে বিন্দুমাত্র রাজি ছিলেন না--- মানুষের নিজের জাতি নির্ধারিত পেশায় থাকা উচিত এমনটাই তিনি মনে করতেন। এহেন পরিমণ্ডলে, আম্বেদকরের জাতি-বর্ণ বিলুপ্ত করার চিন্তাভাবনা ছিল একান্তই বেখাপ্পা।

জীবনের সায়াহ্নে ভারতীয় বৈষম্যভিত্তিক সমাজকে সংশোধন করতে না পারায় গান্ধি তথা জাতীয় কংগ্রেসকে সামাজিক বিপ্লব সাধনের লড়াই-এ যুক্ত করতে না পারায়, হতাশ আম্বেদকর ১৯৫৬-য় তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরকরণের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করেন। আর তার সঙ্গে ধর্মান্তরকরণকে তাঁর হাজার হাজার অনুগামীর সামনে লড়াই-এর পথ হিসাবে দিক্ নির্দেশ করেন। মূল ধারার রাজনীতি ও সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে আম্বেদকর তাঁর লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। পক্ষান্তরে, মূল ধারার চিন্তায় আম্বেদকরকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্রাত্য করে রাখা হয়। আম্বেদকরের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এসে পড়ে অবদমিত জাতির মানুষদের উপর।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেআম্বেদকরকে মূলত দুটি পরিচিতির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সংবিধান প্রণেতা হিসাবে তাঁকে তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত, অবদমিত জাতিদের প্রতিনিধি বা নেতা হিসাবে। প্রথম উল্লিখিত পরিচয়টি আংশিক সত্য, পুরোপুরি না, কারণ আম্বেদকর একা সংবিধান রচনা করেননি। ফলে সংবিধানে কোথাও তাঁর মত প্রতিফলিত

হয়েছে, কোথাও তা হয়নি। দ্বিতীয় পরিচিতিটি অবশ্য সঠিক। একদিকে যেমন আম্বেদকর অবদমিত জাতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন অন্যদিকে তাদের সংগঠিত করতে নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছেন। যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অবদমিত মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় কোনো একজন নেতার নাম করতে হয় তাহলে তা অবশ্যই আম্বেদকর। সে যাই হোক, এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অন্য। আম্বেদকরকে এই দুটি পরিচিতির মধ্যে খণ্ডিত করে এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় যার ফলে সহজেই তাঁকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্য খ্যাতি থেকে বঞ্চিত করা যায়। প্রকৃত অর্থে আম্বেদকরের যোগ্যতা ও অবদান ছিল বিপুল। উল্লিখিত দুটি পরিচিতির বাইরে আরো অনেক কিছু। চিন্তার জগতে তাঁর মৌলিক অবদানের ব্যাপ্তি দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ব। তাঁর সার্বিক অবদান বিবেচনায় আনতে তাঁকে যে মহাপুরুষের মর্যাদা দিতে হয় স্বাধীন ভারতের মূল ধারার সমাজ বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র তা দিতে রাজি ছিল না।

১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে বর্ণ হিন্দুদের প্রায় একচেটিয়া দখল ছিল। সেই রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাই প্রতিফলিত হত। অবদমিত জাতি মানুষদের সংগঠিত হয়ে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার লড়াইয়ের সব ধরনের প্রচেষ্টাকে 'সংকীর্ণ জাতিভিত্তিক রাজনীতি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়; এমন এক রাজনীতি যা ভারতের তথাকথিত 'আধুনিক' চিন্তাভাবনার বিপরীত। ফলে মূল রাজনীতির প্রাঙ্গনে তাঁরা ব্রাত্য থেকে যান। সামাজিকভাবে যাঁরা অস্পৃশ্য, রাজনৈতিক ভাবেও তাঁরা অস্পৃশ্য থেকে যান। আর বলা বাহুল্য, অস্পৃশ্য থাকে আম্বেদকরের চিন্তা-ভাবনা।

৭০-এর দশক থেকে নানা কারণে কিছু পরিবর্তনের হাওয়া বইতে দেখা যায়; কারণগুলির মধ্যে বাম চিন্তার প্রভাব থেকে শুরু করে অবদমিত জাতির মানুষদের মধ্যে সাংবিধানিক আইনী সুযোগ তথা সংরক্ষণের ফলে শিক্ষার বিস্তার বৃদ্ধির ফলে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ভোটের রাজনীতিতে অবদমিত জাতিরা ও তাদের সমস্যাদির উত্তরোত্তর প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মূল ধারার রাজনীতিতে যেমন তাদের বিষয়গুলি উঠে আসতে থাকে, জাতি-ভিত্তিক সংগঠন গড়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়ভাবে বাড়তে থাকে। একদিকে নীচুতলার মানুষরা তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে থাকে, অন্যদিকে বর্ণ হিন্দুরা তাদের প্রতিহত করতে নিজেদের জাতি সংগঠন গড়ার

পাশাপাশি ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে তাদের দলে টানার চেষ্টা চালায়। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতি সমীকরণের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পায়। ৯০-এর দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণিদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণার সাথে সাথে তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনীতিতে জাতির উল্লেখ আর ব্রাত্য থাকে না। ক্রমেই দেখা যায়, প্রথমে মধ্য জাতিগুলির উত্থান ও তারপর দলিতের তথা অস্পৃশ্য জাতিসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আম্বেদকরের চিন্তা ভাবনাকে অবলম্বন করে সংগঠিত হওয়ার তাগিদ, ভারতীয় রাজনীতিতে আম্বেদকরের নাম আর আগের মত ব্রাত্য থাকে না।

ক্রমেই দেখা যায় আম্বেদকরের নাম মূল ধারার রাজনীতিতে প্রায়শই উচ্চারিত হয়। আম্বেদকরের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আর যেন শুধু দলিত মানুষের একার নয়। জাতীয় দলগুলি, বলা বাহুল্য আম্বেদকরের অনুগামীদের সমর্থন আদায় করতে, আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী পালন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আম্বেদকরের বাণী উদ্ধৃত করতে থাকে। বাম থেকে দক্ষিণ কেউই বাদ যায় না। আপাতদৃষ্টিতে এটি অতি সুসংবাদ না হলেও, মনে খটকা লাগে। আজ মূলধারার সমাজ ও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি কি সত্যিই আম্বেদকরের পুনমূ র্ল্যায়ন করে তাঁর গুরুত্ব স্বীকার করেছে, না কি অন্য কিছু? ...

এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে তাকাই। 'আম্বেদকরের চিন্তার মূল স্তম্ভগুলি কী'? সংক্ষেপে বললে বলা যায়, জাতি বিভেদহীন সার্বিক গণতন্ত্রের ধারণা যার ভিত্তি সামাজিক ন্যায়, মানবাধিকার এবং সম্মানজনক পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি।

আম্বেদকর ভারতীয় সমাজের আপাত সংস্কার চাননি; তিনি চেয়েছিলেন আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁর কাম্য ছিল অস্পৃশ্যতা দূর করা নয়, সামগ্রিকভাবে জাতি ব্যবস্থাকে দূর করা— এখানেই ছিল গান্ধির সঙ্গে তাঁর চিন্তার বিপুল ফারাক।

যে সামাজিক বিপ্লব আম্বেদকর সংগঠিত করতে চান তার মূল হাতিয়ার হিসাবে তিনি আধুনিক রাজনীতির ভাষাকে ব্যবহার করেন। অবদমিত জাতির মানুষদের জন্য একদিকে সাংবিধানিক সুরক্ষার জন্য তিনি লড়াই করেন। অন্যদিকে তাদের সামনে 'Educate, Agitate, Organize'-এর মত স্লোগান রেখে তাদের সচেতন ও সংগঠিত করায় প্রয়াসী হন।

জাতি, লিঙ্গ বৈষম্যহীন ভারতের মানুষকে তিনি স্বাধীন দেশকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার রসদ হিসাবে দেখেছিলেন। যে রাষ্ট্র যথার্থ গণতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে দ্রুত উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হবে।

উদারনৈতিক মতাদর্শের অবলম্বনে আম্বেদকর তাঁর গণতন্ত্রের ধারণাকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ রাখেননি। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে যুক্ত করে এক সার্বিক গণতন্ত্রের ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন; যেখানে জাতি লিঙ্গ বিভেদহীনভাবে মানুষ মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানে লিপ্ত হবে। যেখানে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা থাকবে দুর্বলতর শ্রেণির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে; যেখানে মূল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় মানুষ পুঁজির সীমাহীন শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। রক্ষিত মানুষের নিজেদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে আম্বেদকর তাদের স্বীয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

আম্বেদকরের সমস্ত চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাগিদ। সেই তাগিদই তাঁকে অস্থিরভাবে পরিত্রাণের পথ অনুসন্ধানে বাধা করে। সেই তাগিদেই তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে মানবতা-নির্ভর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বলা যেতে পারে এটি তাঁর জীবনের শেষ বড় সামাজিক-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বর্ণভেদ সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ও তার পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে তাঁর সারা জীবনের আপোষহীন সংগ্রামের সর্বশেষ ধাপ।

এবার আসি আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তরে। 'আম্বেদকর, তুমি কার?' উত্তরটি বোধহয় ইতিমধ্যেই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আম্বেদকর সবার নন। আম্বেদকর শুধু তাদেরই হতে পারেন যারা সামাজিক ন্যায়, তথা মানবাধিকারে বিশ্বাসী, যারা বর্ণহীন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, যারা লিঙ্গভেদহীন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। যারা যথার্থ সার্বিক অর্থে গণতন্ত্রের উপাসক।

আম্বেদকরকে নিজের বলে দাবি করতে গেলে যে উত্তরণ প্রয়োজন তা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের উপাসনার মধ্যে দিয়ে সম্ভব নয়। তা মাত্র সংবিধানের মূল নীতিগুলি ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপাসনার মধ্যে দিয়ে সম্ভব।

স্বাধীন ভারতের এই মূল্যবোধগুলির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সাংবিধানিক কাঠামো আর দীর্ঘদিনের ধাপে ধাপে গড়ে তোলা দলিত আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে আজ দলিতরা সীমিত পরিমাণে হলেও তাঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে

সক্ষম হয়েছে--- শিক্ষাক্ষেত্রে, চাকুরি ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগতি চোখে পড়ে। চেতনার একটা নতুন স্তরে আজ তাঁরা উন্নীত, যেখানে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজ পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে উদ্যত হয়। তাদের আর্থ-সামাজিক লড়াই, তাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে তার স্পষ্ট প্রতিফলন। কায়েমি স্বার্থ তথা সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষের শক্তিগুলি আজ যারপর নাই বিচলিত। তারা দলিত মানুষের এই উত্থানকে যে কোনো প্রকারে রুখতে উদ্যত। তাই, একদিকে চলে দলিতদের জীবন জীবিকার উপর নৃশংস আক্রমণ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটা চরম লাঞ্ছনা ও নিষ্ঠুরতার ঘটনা যার প্রতিকার থাকে দুরস্ত--- মহারাষ্ট্রের খৈর্‌লানজি, বিহারের বাথানিতোলা, হিসারের মির্চপুর, অন্ধ্রপ্রদেশের সুন্দুর ও অতি সাম্প্রতিককালে গুজরাটের ঊনা যার লজ্জাজনক সাক্ষ্য বহন করে। অন্যদিকে, ভোট বাক্সের দিকে চোখ রেখে আম্বেদকরের মত নেতাকে 'আমাদের নেতা' বলে দাবি করা হয়, তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন হয় ও চিন্তা ভাবনা আচরণে এতটুকু পরিবর্তন না এনেও এক মেকি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলে। ফলে, সাবধান! কথাতেই আছে, সাবধানের মার নেই!

সৌজন্য : পথসংকেত

এক মার্কসবাদীর চোখে আম্বেদকর

ধ্রুব চৌধুরী

কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সমগ্র সমাজকে তাঁরা নানাভাবে প্রভাবিত করেন। সমাজের ওপরতলার মানুষের অবজ্ঞা সত্ত্বেও তাঁদের কার্যকলাপ এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের মতামতকে চেপে রাখা যায় না। এমন একজন মানুষ ছিলেন ডা. বি .আর. আম্বেদকর। ভারতের বুকে জাতিবর্ণগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁর অবদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

তবে সমস্যা হোল প্রায়শই তাঁকে হয় ভগবান বানানো নয় তো শয়তান প্রতিপন্ন করা হয়। ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তাঁর অনুগামীদের এক বড় অংশ দেশের শাসকবর্গের প্রচারের সুরে সুর মিলিয়ে শুধুমাত্র সংবিধান প্রণেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্যদিকে দেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের যাঁরা দাবি করেন সেই মার্কসবাদীরাও দীর্ঘকাল আম্বেদকরকে উপেক্ষা করে চলতে চেয়েছেন।

একদিকে এমন কেন ঘটলো আর অন্যদিকে ডা. আম্বেদকর-এর দৃষ্টিভঙ্গীর ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাৎপর্য ও গুরুত্বের বিশেষ বিশেষ দিক তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই রচনা। আম্বেদকরের পূর্ণ মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এখানে করা হয়নি।

এটা ঘটনা ভারতে জাতিবর্ণ ব্যবস্থাটির মাধ্যমে সমাজকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন এমন সমাজ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভাজন ও সংগঠিত করা হয় যারা বংশানুক্রমিক পেশা, অন্তর্বিবাহ ও সহভোজনের দ্বারা অপরিবর্তনীয় সামাজিক স্তরে বিভক্ত। এই বিভাজন একদিকে উচ্চ জাতিবর্ণকে নিম্নজাতিবর্ণের উপর নিপীড়নের স্থায়ী এক ব্যবস্থা করে দেয়, তেমন নিম্নজাতিবর্ণকেও বিভক্ত করে রাখে তাদের পেশা, অন্তর্বিবাহ ও সহভোজনের নানা বিভাজনে। জাতিবর্ণগত বিভাজনের সাধারণ ব্যবস্থাটির বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন, এর

অপনোদনের কথাও বলেছেন। কিন্তু সম্ভবত আম্বেদকরই প্রথম এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে জাতিবর্ণগত ব্যবস্থা শুধুমাত্র শ্রম বিভাজনের ব্যবস্থা নয়, শ্রমিকদেরও বিভাজিত রাখার ব্যবস্থা। তিনি বলেন যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থাতে শ্রমিকরা (মেহনতী মজুররা) তাঁদের পেশাভিত্তিক নানা সামাজিক স্তরে বি ভক্ত হয়ে থাকেন। অন্য কোনো দেশে শ্রম বিভাজন এমন কর্মভিত্তিক স্তরে বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত নয়।

এটি ভারতীয় বিশেষ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ব্রিটিশরা এদেশ কারখানাভিত্তিক শ্রমবিভাজনে করলেও সামাজিক স্তর বিন্যাসকে জিইয়ে রাখে এবং শ্রমিকদের মধ্যেও এই বিভাজন স্পষ্ট থাকে। অন্যান্য দিক বাদ দিলেও এর ফলে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরানো সহজ হয় এবং অন্যভাবে বললে শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা কঠিনতর হয়।

এমনকী অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়েও তিনি ইউরোপীয় সমাজ বিভাজনের সঙ্গে এর পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে— "অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস অস্পৃশ্যতা একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা। এটা সত্য, কিন্তু এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বটে। এটি দাসব্যবস্থার চেয়েও খারাপ। দাসব্যবস্থাতে মালিককে দাসের খাওয়াদাওয়া, জামাকাপড় ও থাকার জায়গার দায়িত্ব নিতে হয়। সে অন্তত এমন অবস্থাতে থাকে যাতে তার বাজারের দাম কমে না যায়"।

তিনি আরো লেখেন-- "কিন্তু হিন্দু অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থাতে অস্পৃশ্যের টিকে থাকার জন্য কোনো দায়িত্বই নেওয়া হয় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে তা দায়িত্বহীন শোষণের সুযোগ করে দেয়। অস্পৃশ্যতা শুধু এক সামাজিক নিপীড়নের ব্যবস্থা নয়, নিয়ন্ত্রণহীন অর্থনৈতিক শোষণের ব্যবস্থা"।

ভারতীয় সমাজ অর্থনীতির এই গভীর বিশ্লেষণ যে কোনো মার্কসবাদীর ক্ষেত্রেই শিক্ষণীয়।

কিন্তু এতসত্ত্বেও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উৎস সম্পর্কে কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তা গড়ে উঠলে, তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গভীরতার অভাব দেখা যায়। এক নির্দিষ্ট সামাজিক চলনে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসনে এক বিশেষ সামাজিক কাঠামো হিসাবে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা যে গড়ে ওঠে, তার নির্দিষ্ট বিশ্লেষণে না গিয়েও তিনি বললেন—"জাতিবর্ণ ব্যবস্থাতে আনীত শ্রমবিভাজন নিজেদের বেছে নেওয়া ভিত্তিতে বিভাজন নয়। ব্যক্তিগত মনোভাব বা ভাল লাগা না লাগার এখানে

কোনো স্থান নেই। এটি পূর্বনির্ধারিত গোঁড়ামির(dogma) ভিত্তিতে গঠিত।"

স্বভাবতই এমন এক ধারণা জাতিবর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো-এর উৎস তার বিরুদ্ধে তাকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে চালিত না করে, উপরিকাঠামোর ও সাংস্কৃতিক রূপের পরিবর্তনের দিকে চালিত করে। অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থার কথা তিনি নিজেই বলেছেন, তাকে পরিবর্তনের চেয়ে সামাজিক সংস্কার সাধন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অথচ এটাও লক্ষণীয় যে আম্বেদকর নিজেও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য বড় বড় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। উদাহরণ হিসাবে খোট (Khot system) ব্যবস্থার অবসান, মাহার শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আন্দোলনগুলিকে বলা যায়। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের জন্য তিনি যৌথ খামার গড়ে তোলার কথাও বলেছেন। তাঁর অধিকাংশ অনুগামীই এসব বিষয়ে তাঁর ধারণার কথা জানে না বা শাসক-শোষকবর্গের দ্বারা চালিত হয়ে এগুলি সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে।

আর মার্কসবাদীরাও এ নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে তাঁকে শুধু সংবিধান প্রণেতা বা সংরক্ষণ ব্যবস্থার জনক হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি সীমা পর্যন্ত গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় এটি যেমন ঠিক, তেমনই আবার এর দুটি বড় দুর্বলতা দেখা যায়। প্রথমত, ব্যাপক গ্রামীণ জনগণ, যেখানে জাতিবর্ণগতভাবে দলিত মানুষের অধিকাংশ বাস করেন, এর দ্বারা কম প্রভাবিত হন। দ্বিতীয়ত, আম্বেদকরের সূত্র অনুযায়ী এই জাতিবর্ণ ব্যবস্থা মেহনতীদেরও বিভাজিত করে, এর ফলে তাঁদের মধ্যেকার কোনও কোনও জাতিবর্ণ শিক্ষাদীক্ষায় কিছু অগ্রসর হয়ে সংরক্ষণের সুবিধার বড় অংশ উপভোগ করে, অন্য অংশ বঞ্চিত থেকে যায়।

তবে এ প্রসঙ্গে এটা স্পষ্ট করা ভাল যে, সুবিধাভোগী সামাজিক অংশটি দ্বিতীয় কারণটিকে সামনে এনে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার অপপ্রয়োগ চালাচ্ছে। ওদের দ্বারা মার্কবাদীদের একাংশও প্রভাবিত হচ্ছে। এ চিন্তার বিরোধিতা প্রয়োজনীয়।

আম্বেদকর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

মার্কসবাদী মহলে আম্বেদকর সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা বেশ জোরদারভাবে উপস্থিত। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা এ বিষয়ে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেন না। ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের ''স্বরাজ'' আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। মার্কসবাদীদের

মধ্যেও পল্লবগ্রাহিতা এত বড় আকারে উপস্থিত যে এর পিছনের ইতিহাসকে তাঁদের ব্যাপক অংশই ভুলে যান।

প্রকৃত ইতিহাসটি কী? খোট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশরা খোটি ব্যবস্থার কিছু সংশোধন করে খোট হিসেবে পরিচিত সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের ক্ষমতার হ্রাস করতে চায়। খোট ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষক ও তাদের পরিবার বংশপরম্পরায় খোটদের বাঁধা মজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য থাকতো।

বাল গঙ্গাধর তিলক নিজেও একজন খোট ছিলেন। এই সময় তিনি একদিকে ব্রিটিশদের সংস্কার সাধনের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রবন্ধ লিখে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্যদিকে আম্বেদকর 'স্বরাজ'-এর বিপরীতে 'সুরাজ'-এর আওয়াজ দেন।

তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতাদের সামন্ততন্ত্র এবং জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থনকে না দেখে আম্বেদকর-এর অবস্থানকে বিচার করার অর্থ নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক উচ্চবর্ণগত অবস্থাকেই প্রকাশ করা।

আম্বেদকর যে ব্রিটিশদের বিভাজনের চক্রান্ত সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আমরা অজস্র পাই। তিনি দলিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

''আপনারা নিজেরা ছাড়া অন্য কেউ আপনাদের দুরবস্থার অবসান ঘটাতে পারবে না আর আপনারা নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে তা অর্জন করতে পারবেন না।

''ব্রিটিশ সরকার যেমন আছে তেমন থাকলে আপনাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার কোনও অংশ আসবে না। শুধুমাত্র একটি সুরাজ সংবিধানের মাধ্যমে আপনারা রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে পেতে পারেন। অন্য কোনও উপায়ে আপনাদের মুক্তি আসতে পারে না।''

উদ্ধৃতিটি বি.টি. রণদিভের 'কাস্ট, ক্লাস অ্যান্ড প্রপার্টি রিলেশনস' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। এর মাধ্যমে এটা স্পষ্ট মার্কসবাদীদের সকলেই আম্বেদকরকে উপেক্ষা করেননি। তাঁদের মধ্যে নানা ধরনের মনোভাব বিদ্যমান ছিল ।

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা অবসানের ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অনুসৃত পদ্ধতি

আম্বেদকর-এর স্পষ্ট ধারণা ছিল— 'বাধ্য করার মত যথেষ্ট শক্তি ব্যতিরেকে কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূরা কখনই স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করবে না।' এই স্পষ্ট ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কায়েমি স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে এমন শক্তিটি কী? তা

কী শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব? এর উত্তর দিতে গিয়ে আম্বেদকর নানা স্ববিরোধের মধ্যে পড়েছেন।

জাতিবর্ণব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য আম্বেদকরের নিদান ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাংবিধানিক গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে তাঁর ধারণাকে তুলে ধরার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

''আমার মনে হয় সামাজিক সম্পর্কের চালিকা শক্তি হিসাবে পৃথিবী থেকে গণতন্ত্র যাতে উঠে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যদি তাতে বিশ্বাস করি তবে এর প্রতি সৎ থাকতে হবে এবং একে মেনে চলতে হবে। আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে আমরা যাই করি না কেন গণতন্ত্রের শত্রুদের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে আমরা উচ্ছেদ করতে দেব না।'' (অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস কনফারেন্স, তৃতীয় অধিবেশন, ১৯৪২)।

''গণতন্ত্র হচ্ছে সরকারের এমন এক রূপ ও পদ্ধতি যার মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিনা রক্তপাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায়। ... যারা জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চায় তাদের কার্যকর হতে গণতন্ত্র যদি সক্ষম করে তোলে এবং জনগণ সেই পরিবর্তন বিনা রক্তপাতে মেনে নেয়, তবেই আমি বলবো গণতন্ত্র রয়েছে। এটি একটি প্রকৃত পরীক্ষা। কোনও বস্তুর গুণ বিচার করতে গেলে, তাকে চরমতম পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে হয়।''

পরিবর্তিত ব্যবস্থাটি কী হবে সে সম্পর্কেও তাঁর নির্দিষ্ট ধারণা হোল—''যৌথ চাষের পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের সংশোধিত রূপ। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুঁজি যোগানের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের উপর। ... মালিকানার একীকরণ এবং ভাগচাষের আইন একেবারে অকেজো বললেও কম বলা হয়। তা কৃষিতে উন্নতি ঘটাতে পারে না। চাষের জমির একীকরণ বা বর্গাদারী আইন কোনওটাই ৬ কোটি অস্পৃশ্যের জীবনে কোনও পরিবর্তন আনবে না। কেননা তারা ভূমিহীন মজুর। শুধুমাত্র প্রস্তাবিত যৌথ খামারই তাদের সাহায্য করতে পারে। (মেমোরেন্ডাম টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি)।

জাতিবর্ণব্যবস্থার অবসান যে শুধুমাত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব নয়, তার জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন তা আম্বেদকর-এর কাছে স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি যত বিরোধিতাই করুন না কেন,

গান্ধীবাদের প্রভাব তাঁকে অহিংসার মাধ্যমে সমাধানের মধ্যে সীমিত রেখেছিল, একইসাথে পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁকে গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের নীতিতে আস্থাশীল করে তুলেছিল। তাঁর দাবি ছিল–

(১) কৃষিকে রাষ্ট্রীয় শিল্পে পরিণত করা এবং যৌথ খামার গড়ে তোলা।

(২) মূল এবং প্রাথমিক শিল্পগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনায় থাকবে।

(৩) রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হবে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে এমনভাবে পরিকল্পিত করা যাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের রাস্তা বন্ধ না করে উৎপাদনশীলতার উচ্চতম বিকাশ এবং সম্পদের সম (equitable) বন্টন।

সামন্ততন্ত্রের অবসানের লক্ষ্যে গণতন্ত্রীয় পরিকল্পনা ছাড়া এটি অন্য কিছু নয়। আর শিল্প সম্পর্কিত নীতি নেহেরু অনুসৃত নীতির সঙ্গে প্রায় মিলে যায়।

তাঁর এই ধরনের চিন্তা গান্ধবাদীদের সঙ্গে বিপরীতধর্মী আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমস্ত রাস্তা উন্মুক্ত রাখার চিন্তা তাঁকে কমিউনিস্টদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমন এক অবস্থায় সুযোগসন্ধানী ভারতীয় শাসকবর্গ তাঁকে নিজেদের সঙ্গে আত্তীকৃত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান প্রণেতাদের প্রধান হিসাবে বেছে নেয়। তিনিও তাতে রাজি হতে বাধ্য হন। কিন্তু সংবিধান রচনার পর্যায়েই বুঝে যান তিনি যা চান তা তাঁর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। বহুক্ষেত্রেই নিজের মতকে সংবিধানে উপস্থিত করে উঠতে পারেননি। ফলে সংবিধান গ্রহণের সময়েই তিনি ঘোষণা করেন— ''২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ আমরা এক স্ববিরোধের জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। রাজনীতিতে আমাদের সমতা রয়েছে, কিন্তু সমাজ অর্থনৈতিক জীবনের থেকে যাচ্ছে অসাম্য। রাজনীতির ক্ষেতের আমরা একজনের একটি ভোট এবং প্রতিটি ভোটের সমমূল্যের নীতিকে মেনে নিয়েছি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে আমরা এক ব্যক্তির এক ভোটের নীতিকে অস্বীকার করে চলব।''

আসলে বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রেই সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি যেমন সাম্রাজ্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক কৌশলের দিকটিকে লক্ষ্য করেন নি, তেমনই রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেও অতি বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু সংবিধান রচনাকালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এক চরম স্ববিরোধের জন্ম দেওয়া হচ্ছে। তাই তিনি বলেছিলেন—''আমরা এই স্ববিরোধের জীবন নিয়ে কতদিন চলবো? কী করে চলবো? যদি আমরা দীর্ঘদিন ধরে তা অস্বীকার করে চলি তবে তা আমাদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে ধ্বংসের

দিকে ঠেলে দেবে। যত শীঘ্র সম্ভব এই স্ববিরোধের অবসান ঘটাতে হবে, তা না হলে যারা এই অসাম্যের শিকার তারা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামোকে গুঁড়িয়ে দেবে''।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি যেভাবে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণের কথা ভেবেছিলেন তা সম্ভব নয়। অথচ নীতিগতভাবে তিনি অন্য কোনও পন্থার কথা ভাবতে পারেননি। আসলে অন্তরের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে চিন্তাই থাকুক না কেন তাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কাজটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেলেন। আর শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিজীবনে সামাজিক সমতার আশাতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পথে হাঁটলেন। জীবন দেখিয়ে দিয়েছে সে পথেও দলিত মানুষদের অধিকার আজও প্রতিষ্ঠা হয়নি।

কিন্তু মার্কসবাদীদের চিন্তার সীমাবদ্ধতাও আম্বেদকরকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা বাধার সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে শ্রেণিসংগ্রামের এবং জাতিবর্ণগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বকে পৃথকভাবে স্বীকার করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। অনেক সময়েই আম্বেদকর-এর নেতৃত্বের সংগ্রামকে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চক্রান্ত বলে অভিহিত করতেও নেতৃত্বের একাংশ দ্বিধা করেননি।

আসলে সমস্যাটি হচ্ছে ভারতের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগের প্রশ্নে কমিউনিস্টদের মধ্যে যান্ত্রিকভাবে ইউরোপীয় সমাজবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে মিল খাওয়ানোর ভ্রান্ত মনোভাব। ফলে শ্রেণিসংগ্রাম ও জাতিবর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্যেকার আন্তঃসংযোগ সম্পর্কে সেই ধারণার অভাব ছিল। **এটা সঠিক শ্রেণিসংগ্রাম ও জাতিবর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রাম এক ও অভিন্ন নয়। কিন্তু তারা পরস্পরের বিপরীত বা বিরোধী বা সমান্তরালও নয়, তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং পরস্পরের সহায়ক।**

যে সামাজিক অংশটি যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়ে এসেছে তার প্রতিনিধি হিসাবে আম্বেদকর-এর মধ্যে অন্যদের প্রতি অবিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু মার্কসবাদের দ্বারা বলীয়ান শ্রমিক শ্রেণি অগ্রবাহিনীর দিক থেকে ভারতের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই নিপীড়িত মানুষদের পৃথকভাবে সংগঠিত করলে বা পৃথকভাবে সংগঠিত হলে তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রাচীন ব্যবস্থাটিকে ভেঙে ফেলার সংগ্রামকে অগ্রসর করার দায়িত্ব থেকেই যায়।

আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব এত গভীর যে অনেক সময়ই নিজের অজান্তেই ভুল ধারণার বশবর্তী হতে হয়। তা না হলে ব্রিটিশদের সঙ্গে নানা বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, এমনকী তাদের দূত হিসাবে নিয়োজিত রামমোহন রায়কে সমাজ সংস্কারক হিসাবে যাঁরা মর্যাদা দিয়ে থাকেন, তাঁরা আম্বেদকরকে একই মর্যাদা দিতে পারেন না — এটাকে ব্যাখ্যা করা কঠিন।

আম্বেদকর সর্ববিষয়ে সঠিক ছিলেন না, তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। তিনি সাংবিধানিক চৌহদ্দিতেই জাতিবর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রেখে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। তা অসম্ভব ছিল এটা বোঝা যায়। কিন্তু তিনি যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার গভীর বিশ্লেষণে গেছেন, জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, জাতিবর্ণভেদ ভারতে যতটা দুর্বল হয়েছে তার পিছনে তাঁর অবদানকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? তা করলে ভারতের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কেই ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয় এই দ্বান্দ্বিক চিন্তা মার্কসবাদ আমাদের শিক্ষা দেয়।

আম্বেদকর: মনুসংহিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপকার

গুরুপ্রসাদ কর

ভারতীয় শাসকরা দীর্ঘদিন উপেক্ষা করবার পরে বর্তমান পরিস্থিতিতে কৌশল করে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার বানিয়ে দিয়েছেন। এমনক আম্বেদকরপন্থী বুদ্ধিজীবী সহ অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনের নিম্নবর্ণের যেসব নেতা নেত্রী আছেন তারাও আম্বেদকরকে স্মরণ করতে গিয়ে মূলগতভাবে তাকে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার হিসাবেই সম্মান জানিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তব হল যে আম্বেদকর যে স্তরের বৌদ্ধিক চর্চার অধিকারী ছিলেন, যে উদারনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেভাবে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তা ভারতীয় সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোতে প্রতিফলিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আর এর মূল কারণ হল ব্রিটিশের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা যে শ্রেণিগুলির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল তারা কেবল ব্রিটিশ শাসকদের সেবকই ছিলেন না, তারা একদিকে ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শে নিমজ্জিত দলিত নিম্নবর্গীয় মানুষের নিপীড়নকারী উচ্চবর্ণীয় শক্তির প্রতিভূ এবং অন্যদিকে ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল উদ্বৃত্ত লুণ্ঠনকারী শ্রেণি। আম্বেদকর সম্ভবত আশা করেছিলেন যে একটি উদারনৈতিক সংবিধানের সাহায্যে চলতি সংসদীয় কাঠামোর মধ্যেই দলিত ও নিম্নবর্গের মানুষের কল্যান সাধন করা সম্ভব হবে।

বাস্তবত ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা এতই প্রবল ছিল যে সংবিধান গণপরিষদে আম্বেদকর-এর নির্বাচনও সুষ্ঠুভাবে হতে পারেনি। কংগ্রেসীরা গণপরিষদে তার অংশগ্রহণকে সমস্ত উপায়ে আটকাবার চেষ্টা করেছিল। ৩০০০ কোটি টাকা খরচ করে যে বল্লভ ভাই প্যাটেলের ৫৯৭ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তি বানানো হল সেই প্যাটেল সম্পর্কে সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস তার 'জীবন ও সংগ্রাম ড. আম্বেদকর' বইতে লিখেছেন, ''... বল্লভ ভাই প্যাটেল ঘোষণা করে দেন যে ড. আম্বেদকর-এর গণপরিষদে ঢোকার সব রাস্তা কংগ্রেস বন্ধ করে

দিয়েছে। তারা কংগ্রেসের সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করে দেয়, যাতে তাঁরা ড. আম্বেদকরকে ভোট দিতে না পারেন''। শেষপর্যন্ত ড. আম্বেদকরকে বাংলা থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত করে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। কংগ্রেসের সমস্ত রকম নোংরা বিরোধিতা সত্ত্বেও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলার প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ সোহরাবর্দ্দি-এর মন্ত্রীসভার সহায়তায় এই অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করেন। এরপরে আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর গণপরিষদে কংগ্রেসের সাথে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে আম্বেদকর যে বক্তব্য রাখেন তা তার আগেকার বক্তব্যের সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। প্রসঙ্গত এর আগে তিনি বলতেন 'ভাররত যে স্বাধীনতার পেতে চলেছে তা কেবল হিন্দুদেরই স্বাধীনতা, নিম্নবর্ণীদের স্বাধীনতা নয়'। এরপরে খুব স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস সুযোগ বুঝে আম্বেদকরকে বোম্বে থেকে গণপরিষদে জিতিয়ে আনে। বাস্তবতঃ সংবিধানের কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট যে ড্রাফট কমিটি তৈরি হয় যার চেয়ারম্যান ছিলেন আম্বেদকর, সেই কমিটির বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। গণপরিষদের অফিসে নিযুক্ত আমলারা ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ ভারত আইনে ভিত্তিতে সংবিধান তৈরির কাজ শেষ করে ফেলেছিল। ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ ভারত আইনের ৩৯৫টি ধারার মধ্যে ২৫০টি ধারা হয় অপরিবর্তিতভাবে বা সামান্য সংশোধন করে গৃহীত হয়েছিল। বাস্তবত আমাদের শাসকেরা মিসা, পোটা, ইউএপিএ ইত্যাদি যে কালা আইনগুলি সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক মানুষদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ব্যবহার করে সেগুলির জনক ব্রিটিশ শাসকরাই। সেগুলি ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই তৈরি হয়েছিল। আজও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার জন্য কৃষক সহ দরিদ্র মানুষদের জমি কেড়ে নেওয়া হয় ১৮৯৪ সালের ব্রিটিশ আইন ব্যবহার করে। তবে সংবিধানের অন্তিম খসড়া তৈরির বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজ আম্বেদকরকে প্রায় একা হাতেই করতে হয়েছিল।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও শেষবিচারে আম্বেদকর ছিলেন প্রতিবাদী চরিত্রের। কংগ্রেসের চাটুকারিতাকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ১৯৫৩ সালে সংসদে তিনি বলতে বাধ্য হন, ''আমি সংবিধান তৈরি করেছি— এই অজুহাতে কংগ্রেস সদস্যরা বহু অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের পক্ষে গলা মেলাচ্ছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার পরিষ্কার বক্তব্য হলো, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আমি ছিলাম ভাড়া করা ঘোড়ার মত। আমাকে যা করতে বলা হয়েছে, আমি তাই করতে বাধ্য

ছিলাম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে। আমার একজন বন্ধু বললেন যে, গণপরিষদে আমি সংবিধানের পক্ষে সওয়াল করেছি। এর জবাবে আমার বক্তব্য হলো— আমরা উকিলরা বহু জিনিসের পক্ষে সওয়াল করি; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটাই আমার মতামত। আপনাদের অভিযোগ সংবিধান আমি লিখেছি, ওটা নাকি আমার সংবিধান। তাই যদি হয়, তাহলে আমি বলছি, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে ঐ সংবিধান পুড়িয়ে ফেলতে প্রস্তুত। আমি ঐ সংবিধান চাই না। ওটা কারুর পক্ষে ভাল নয়'' ('জীবন ও সংগ্রাম: ড. আম্বেদকর' - সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস)।

তাহলে ভারতীয় রাজনীতিতে আম্বেদকর-এর আসল গুরুত্ব কোথায়? আম্বেদকর ছিলেন মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ যিনি কিনা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচারের শিকার হয়েও দেশে এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। যেমন অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে তেমনটা তার ক্ষেত্রে ঘটেনি অর্থাৎ নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরুপদ্রব জীবন যাপন তিনি করেননি। নিজের পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগিয়ে ও বিদেশের সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে তার সবসময়ই মনে হয়েছে যে ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথা এমন একটি প্রথা যা শ্রেণি ব্যবস্থার থেকে আলাদা। ঔপনিবেশিক শাসন নিশ্চয়ই জনগণের উপর সবচেয়ে বড় নিপীড়ন, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয়েও যদি জাতি-বর্ণ প্রথা বজায় থাকে তাহলে কিছুতেই কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর সেটা উপলব্ধি করেই তিনি উদ্যোগ নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব তথা গান্ধির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত ১৯২১ সালে 'জাতির পিতা' লিখেছেন, ''জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে ভেঙে ইউরোপের মত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করার অর্থ হল হিন্দুদের বংশানুক্রমিক পেশার নীতিটাকেই বিসর্জন দেওয়া যা কিনা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার আত্মা। বংশানুক্রমিক পেশার নীতিটি হল সর্বজনীন নীতি। একে বদলানোর অর্থ হল নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। যদি প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণ শূদ্রে ও একজন শূদ্র ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয় তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা হল সমাজের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। যারা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা ভাঙতে চান আমি তাদের সর্বৈব বিরোধী'' (আম্বেদকর রচনাবলী, খণ্ড-১২, বোম্বে ১৯৭৯-৯৩)।

ভারতবর্ষের সমাজ নিয়ে আম্বেদকর-এর ভাবনাচিন্তা ছিল যথার্থই বৈপ্লবিক। যেখানে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনে জাতিভেদ প্রথার ঘোর সমর্থক

উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য, যেখানে তথাকথিত সমাজ সংস্কার আন্দোলনে শূদ্র, অতিশূদ্র মানুষের কোনো স্থান নেই, সেই সমাজ সংস্কারে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তিনি কেবল অস্পৃশ্যতা নয়, জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার বিলোপসাধন ঘটিয়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি তথাকথিত জাতীয় আন্দোলনের বাইরে দলিত সমাজের নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেন।

তিনি গত শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে অস্পৃশ্যদের নিয়ে যে আন্দোলনগুলি গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আদায় করা, সাধারণের জন্য ব্যবহৃত পুকুরের জল অস্পৃশ্য কর্তৃক ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৭ সালের মাহার সত্যাগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যেখানে হাজার হাজার দলিত মানুষ উচ্চবর্ণীয় রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আম্বেদকর-এর আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। তবে এই আন্দোলনে বর্ণহিন্দু পরিবারের বেশ কিছু প্রগতিশীল সদস্যও যুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলন চলাকালীন ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর আম্বেদকর হিন্দুধর্মের বিশেষ গ্রন্থ যেখানে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে সেই 'মনুসংহিতা' গ্রন্থটি পুড়িয়ে দেন। সম্ভবত তার এই সাহসিক কর্মসূচি ভারতীয় ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মজার ব্যাপার হল যে ১৯৪৯ সালের ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক-এর মুখপত্র 'অরগানাইজার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল, ''আমাদের সংবিধানে প্রাচীন ভারতে সংবিধান সংক্রান্ত যে বিকাশ ঘটেছিল তার কোনো উল্লেখ নেই। ... আজও মনুসংহিতাতে উল্লিখিত আইনগুলি সমগ্র বিশ্বে প্রশংসা পায় এবং তা স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য ও মান্যতা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের সংবিধান বিশেষজ্ঞরা একে কোনো গুরুত্বই দেয়নি''। প্রসঙ্গত মনুসংহিতাতে যা বলা হয়েছে তা বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মের ইতিহাসে বিরল। কয়েকটি উদাহরণ এইরকম– জাতিভেদপ্রথাকে যুক্তিসিদ্ধ করতে বলা হয়েছে: ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় বাহু থেকে, বৈশ্য উরু থেকে এবং শূদ্র সৃষ্টি হয়েছ পা থেকে। শূদ্রদের উপর শোষণ নিপীড়ন চিরস্থায়ী করতে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কিছু এইরকম: * শূদ্রদের কোনো সম্পত্তি থাকবে না। * শূদ্র অর্থসঞ্চয় করতে পারবে না কারণ তার সম্পদ থাকলে সে গর্বভরে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করতে পারে। * দাসবৃত্তি থেকে শূদ্রের কোনো

মুক্তি নেই। * ব্রাহ্মণের নিন্দা করলে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদন বিধেয়। * দ্বিজকে প্রহার করলে শূদ্রের হাত কেটে ফেলা বিধেয়। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিত মানুষের যে আন্দোলন ফেটে পড়েছিল সেখানে গণসমাবেশ, জনগণের শক্তির উপর নির্ভরতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল এবং এই আন্দোলন ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। একইসাথে তিনি শ্রমিক আন্দোলনেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং সেখানেও অস্পৃশ্যতা ও বর্ণগত বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন যার গুরুত্ব সেই সময়কার শ্রমিক আন্দোলনের মার্কসবাদী নেতৃত্বও সেভাবে উপলব্ধি করেননি। বর্তমান ভারতে দলিত ও নিম্নবর্ণের মানুষ যে শিক্ষা ও চাকুরীতে সংরক্ষণের কিছু সুবিধা ভোগ করেন সেটাতেও তাঁর ভূমিকাই প্রধান।

পরবর্তীতে আম্বেদকর দলিত আন্দোলনকে সামাজিক সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দলিতদের রাজনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে আনেন। কিন্তু সেখানেও নিম্নবর্ণের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই যখনই কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন, বাধা এসেছে সেই উচ্চবর্ণীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে। বিশেষত অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আটকাতে ১৯৩২ সালে জেলের ভেতর গান্ধি অনশনে বসে পড়েন। জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের নামে সমস্ত দেশজুড়ে বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব তাদের হিংস্র দাঁত-নখ বের করে দাপাদাপি শুরু করে। অনেক অঞ্চলে কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী অস্পৃশ্যদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে। উগ্র জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে আম্বেদকরের উপরেও আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা তৈরি করে। কৌশল করে এই অন্যায়ের পক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথকেও জুড়ে নেওয়া হয়। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে একটি পর্যায়ে আম্বেদকরকে পুণা চুক্তির মধ্য দিয়ে সমঝোতা করতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে আম্বেদকর একটি পর্যায়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামার মধ্যেই দলিত ও নিম্নবর্ণীয় মানুষদের জন্য অধিকার অর্জন করার সংগ্রাম শুরু করেন। তার ফলে সংসদীয় ও আইনি কার্যকলাপে জড়িয়ে গিয়ে জাতিবর্ণ বিভাজন মুক্ত বিকল্প স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাকে হাজির করা যায়নি যা হয়তো ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্ব পরিচালিত কংগ্রেসের আন্দোলনের বিপরীতে একটি প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারার জন্ম দিতে পারতো। আর সেটা হলে নিম্নবর্ণের মানুষের জাগরণের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী ধারা

ও প্রধান ধারা হিসাবে আবির্ভূত হতে পারত। তবে তিনি তার মেধা ও সাহসকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্রাহ্মণ্যবাদী চাটুকারিতা ও গান্ধিজীর বর্ণবাদী ও আপোষকামী চরিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন যা ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রসদ হিসাবে কাজে লেগেছে। আর এই কারণেই যত দিন যাচ্ছে নিম্নবর্ণীয় মানুষ ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির কাছে আম্বেদকর-এর গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। আর এই প্রবণতায় আতঙ্কিত হয়ে যারা একসময় আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙায় অভ্যস্ত ছিল, সেইসব শাসকদের আম্বেদকরকে নিয়ে ভণ্ডামিও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

অপরদিকে আম্বেদকর কৃষিজমির মালিকানার সাথে দলিতদের স্বার্থের সম্পর্ক নিয়েও কিছু চিন্তাভাবনা করেছিলেন। নানা ধরনের জমিদারী শোষণের বিরোধিতা করে সমস্ত কৃষিজমির জাতীয়করণের পক্ষে মতামত রেখেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের বিকাশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে দলিত ও নিম্নবর্গীয়দের মুক্তির প্রশ্নের সাথে বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার ও কৃষিতে নানা ধরনের আধা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের উচ্ছেদের গভীর আন্তঃসম্পর্ক তিনি সেভাবে গুরুত্ব দেবার সময় পান নি। জাতিবর্ণভিত্তিক আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রাখার পিছনে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থের বিষয়টির ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দলিত মানুষের মুক্তির প্রশ্নে ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থা উচ্ছেদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে তিনি যেসব বিতর্ক, সংগ্রাম ও নানাধরনের বৌদ্ধিক কার্যকলাপ চালিয়েছেন তা ভারতবর্ষের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই অংশ। বিশেষত জ্যোতিবা ফুলে ও আম্বেদকর-এর প্রভাবে মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলন ও দলিত সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাক প্যান্থার আন্দোলনের অনুকরণে ১৯৭৩ সালে মহারাষ্ট্রের দলিত প্যান্থার আন্দোলন দলিত সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন চলাকালীন আম্বেদকরের উদাহরণ অনুসরণ করে একটি সভায় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সমর্থনকারী গ্রন্থ 'ভগবদ গীতা' পোড়ানো হয়। সেইসময় মহারাষ্ট্রের হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে ব্যবহার করে এই আন্দোলনের সংগঠকদের উপর জঘন্য আক্রমণ সংঘটিত হয়। কিন্তু এতসব আক্রমণের পরেও জাতিবর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইকে স্তব্ধ করা যায়নি।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত ছাত্রদের উপর একের পর এক আক্রমণ, গুজরাটের উনায় দলিত মানুষের উপর ভয়াবহ আক্রমণ

এবং বিশেষত রোহিত ভেমুলার মৃত্যু দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন করে গণজাগরণ ঘটিয়েছে। আর তার সাথে সাথে একদিকে যেমন আম্বেদকর আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন তেমনি অন্যদিকে শাসকরা ভয় পেয়ে দলিত, আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় মানুষের স্বার্থের পক্ষে থাকা বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীদের কালা আইন প্রয়োগ করে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। সাম্প্রতিককালে ভীমা কোরেগাঁও-এর ঘটনা এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

যাইহোক পরিশেষে আম্বেদকর-মূল্যায়নের প্রশ্ন যদি রাখা যায় তাহলে অনুরাধা গান্ধির একটি উক্তি তুলে ধরে বলা যায়, ''বিশেষত, যেসব দলিত ও নিম্নবর্গের মানুষেরা শিক্ষা অর্জনের পরেও জাতি-বর্ণগত বৈষম্যের শিকার, যাদের সমান অধিকারের দাবিকে নানাভাবে, কখনো চালাকি করে, কখনো সরাসরি পদদলিত করা হয়, তাদের কাছে আম্বেদকর আত্মপরিচয় ও সম অধিকার অর্জন করবার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবেই বিরাজ করবেন'' (*'Scripting the change',* Anuradha Gandhi)।

একটি অসম্পূর্ণ বৃত্তের সন্ধানে বা আম্বেদকরের 'ভারত ও কমিউনিজম'

(১)

অংশ নয়, সমগ্রকে দেখতে চেষ্টা করাই কাজের কাজ। একটা গাছ নয়, সমগ্র অরণ্যকে বুঝতে হবে। প্রায়শঃই এই কাজ থেকে বিরত থাকার ফলে নানা ভুল সিদ্ধান্তের আবির্ভাব ঘটে। এইরকম একটি ভুল সিদ্ধান্ত হলো– আম্বেদকর ছিলেন সাম্যবাদ বিরোধী। এ সিদ্ধান্তের দায় একদিকে যেমন আম্বেদকরপন্থীদের একাংশের, তেমনি মার্কসবাদীদের একাংশেরও বটে। উভয়পক্ষই আম্বেদকরের রচনার থেকে প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করে নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে দাঁড় করাতে চান। ফলে ক্ষতি হয় উভয় পক্ষেরই। যেখানে তাদের কথাবার্তা চালানোর কথা সেখানে তারা একে অপরকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। অনন্ত আচার্য তাই রাগ করে বলেছেন, ''...এদেশে বেশ কিছু নির্বোধ মনে করে যে আম্বেদকর সাম্যবাদ বিরোধী ছিলেন। এদের মধ্যে যেমন ভণ্ড আম্বেদকরবাদী আছেন, তেমনই অর্ধশিক্ষিত বামপন্থীও আছে।'' (আচার্য ২০১৭৮৮)। এই ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণটি মোটেই অযথার্থ নয়। কারণ আম্বেদকরের রচনাসম্ভার কোনো পাঠককে এই ধরণের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে মোটেই সাহায্য করবে না। বরং পাঠককে বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা এবং সাম্যের ধারণার প্রতি তাঁর গভীর সমর্থন ছিলো একই সূত্রে গাঁথা। সেটাই দেখে নেওয়া যাক।

(২)

আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬)-এর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় অসমাপ্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। গ্রন্থটির নাম India and Communism (ভারত এবং সাম্যবাদ)। তাঁর গ্রন্থ রচনার পরিকল্পটি ছিলো এইরকম:

Part-I The Pre-requisits of Communism
Chapter-1 The Birthplace of Communism

Chapter-2 Communism & Democracy
Chapter-3 Communism & Social Order
Part-II India and the Pre-requisites of Communism
Chapter-4 The Hindu Social Order
Chapter-5 The Basis of the Hindu Social Order
Chapter-6 Impediments of Communism arising from the Social Order
Part-III What then Shall we do?
Chapter-1 Marx and the European Social Order
Chapter-2 Manu and the Hindu Social Order

Leftword প্রকাশিত 'India and Communism' (2012) গ্রন্থটিতে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় এবং তার সঙ্গে Symbol of Hinduism শীর্ষক আরো একটি রচনা সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশক জানিয়েছেন টাইপ করা ৬৩টি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে, যা আসলে চতুর্থ অধ্যায়ের দুটি অংশ। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে লেখাগুলি টাইপ করা হয়েছিলো বলে প্রকাশকের মত। Symbols of Hinduism হলো আরো একটি অসম্পূর্ণ বই Can I be Hindu'র একটি অংশ।

Leftword প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থটি (2017) মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত-- প্রথম অংশটিতে রয়েছে আনন্দ তেলতুম্বের একটি দীর্ঘ ভূমিকা, যার শিরোনামটি হলো Bridging the unholy rift। শিরোনামটির মধ্যেই অনেক কথা আছে। সে কথায় পরে আসা যাবে। দ্বিতীয় অংশটি হলো আম্বেদকরের অসম্পূর্ণ লেখা India and Communism। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অধ্যায়, যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

আম্বেদকর India and Communism বইটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। যদি করে যেতে পারতেন তাহলে হয়তো বর্তমানের বেশ কিছু বাদ-বিসম্বাদ এড়ানো যেতো। কিন্তু তা যেহেতু সম্ভব হচ্ছে না, তাই তাঁর অন্যান্য রচনার সাহায্যে একটি 'পাদ-পুরাণ'-এর চেষ্টা চালানো যেতে পারে। যে কথায় ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করা হবে। এখন আম্বেদকরের বইটির কথায় আসা যাক। যে অধ্যায় তিনটি এখানে গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলির শিরোনাম এইরকম-- The Hindu Social Order: Its Essential Principles; (চতুর্থ অধ্যায়); The Hindu Social Order: Its Unique Features (পঞ্চম অধ্যায়), এবং Symbols of Hinduism (সংযোজিত অংশ)।

(৩)

গ্রন্থটির নাম India and Communism হলেও, এখানে কার্ল মার্কসের নাম মাত্র একবারই উল্লেখিত হয়েছে। সরাসরি সাম্যবাদ/মার্কসবাদ নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা পাওয়া না গেলেও, যা পাওয়া গেছে তাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমৃত্যু তিনি যে ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন সেটির গোটাটাই ছিলো একটি চূড়ান্ত অসম, উঁচু-নীচু স্তরভেদে বিন্যস্ত একটি ব্যবস্থা, সেটি হলো ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বেশি সংখ্যক মানুষকে আধিপত্যের অধীনে আনার লক্ষ্যে যাকে 'হিন্দু ধর্ম' বলে বাজারে চালানো হয়। যাইহোক সেই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজের বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, বারংবার যে প্রশ্নে তিনি ফিরে গেছেন তা হলো, এই অসাম্যমূলক ব্যবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্বাধীন, মুক্ত ও সাম্যমূলক সমাজ গড়ে ওঠার যে শর্তগুলির প্রয়োজন, তা এখানে অনুপস্থিত। তার শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক কারণগুলি এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই আলোচনার লক্ষ্যই হলো একটি সমমর্যাদাসম্পন্ন সমাজের প্রতিষ্ঠা। যেহেতু ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থা এর একটি বিপরীত ব্যবস্থা– তাই তাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে আম্বেদকর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

দুঃখ এখানেই যে, যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার লক্ষ্য একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা, সেই ধারাটি এই বর্ণ-জাতগত শোষণ-পীড়নমূলক সমাজটি সম্বন্ধে প্রায় নীরব থেকেছে। 'প্রায় নীরব' বলা হলো এই জন্যেই যে সরবতা অবশ্যই ছিলো, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এবং তার প্রয়োগ ছিলো আরো কম। বি. টি. রনদিভে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) কলোনিয়াল থিসিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে কমিউনিস্টরা অস্পৃশ্যতা ও বর্ণ-জাতভেদের অবসানের লক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করেননি:

"Brithsh rule, the system of landlordism, the reationary caste system, religious deception and all the slane and serf traditons of the past throttle the Indian people and stand in the way of its emansipation. They have led to the result that in India, in the twentieth century, there are still pariahs who have no right to meet with their fellomen, drink from common wells, study in common school, etc." (Ranadive.1991:7)।

বাংলায় অর্থটি এইরকম:- ব্রিটিশ শাসন, জমিদারি ব্যবস্থা, প্রতিক্রিয়াশীল বর্ণ-জাত ব্যবস্থা, ধর্মীয় ছলচাতুরি এবং অতীতের সমস্ত ধরণের দাসত্ব ও ভূমি

দাসত্বের ঐতিহ্য ভারতীয় জনগণকে শ্বাসরুদ্ধ করেছে এবং মুক্তির পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর ফলেই বিংশ শতাব্দীর ভারতে এখনও পারিয়া (একটি অস্পৃশ্য জাত) দের কোনো অধিকার নেই দেশের অন্যান্য সামাজিক অংশের সঙ্গে একই কুয়ো থেকে জল খাওয়ার বা একটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার।

১৯৩০-এর দশকে যে আত্মত্যাগী কমিউনিস্ট কর্মীরা সাম্যবাদের সপক্ষে লড়াই করছিলেন, প্রশ্নটা তাদের দায়বদ্ধতা বা আন্তরিকতা সম্পর্কে নয়, প্রশ্নটা তাদের অচর্চিত বর্ণ-জাতভেদ সম্পর্কে। আর তাদের কাছে এটা আশা করা কোনো অন্যায় নয়। বর্ণ-জাত-এর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র গভীরভাবে যুক্ত তা এখানে অনুক্ত থেকে গেছে। প্রায় সমসাময়িককালে একজন ২৪ বছর বয়সী মার্কসবাদী বিপ্লবীর কিন্তু বিষয়টি চোখ এড়ায়নি। তিনি ভগৎ সিং। ভগৎ সিং অত্যন্ত গভীরভাবে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন একজন দলিত মানুষকে দ্বৈত শোষণের মুখোমুখি হতে হয়। তিনি লিখেছেন:

''ধরা যাক, একটা মানুষ জন্মালেন একটা দরিদ্র অশিক্ষিত পরিবারে, চামার বা মেথরের ঘরে। কী হবে তার পরিণতি? দরিদ্র বলে লেখাপড়ার সুযোগ সে পাবে না। আবার প্রতি মুহূর্তে উঁচু জাতের মানুষের জাতের বড়াইয়ের কাছে তাকে ঘৃণিত, অপদস্ত হতে হবে। ...উগ্র দাম্ভিক ব্রাহ্মণের দল যাদের [নিম্নবর্ণজাত] সচেতনভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে রাখবে। পবিত্র বেদের কয়েকটি বাক্য বলে যাবার অপরাধে যাদের কানে গরম সীসা ঢেলে দেওয়া হয়, তাদের এই শাস্তিভোগের কী ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে? আসলে দোষটা কার?'' (সিং ভগৎ ; ২০১২:৫৬)।

ভগৎ সিং সুনির্দিষ্টভাবেই প্রশ্নটা তুলেছেন। জনগণের দারিদ্রের জন্য যেমন সাম্রাজ্যবাদ দায়ি, তেমনি নিম্নবর্ণ-জাতের উপর পীড়ন ও শোষণের জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দায়ি। এই ছবিটা কিন্তু তাঁর সময়ে অনেকের কাছেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। ধরা পড়লো আম্বেদকরের লেখায়। India and Communism-এ আম্বেদকর এই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ-বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাহসিকতা ও সচেতনভাবে পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই অলভ্য ছিলো। এখানেই আম্বেদকরের গ্রন্থের সার্থকতা।

(৪)

গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে (আসলে চতুর্থ অধ্যায়) আম্বেদকর হিন্দু সমাজ বিন্যাসের আবশ্যিক নীতিগুলির অনুসন্ধান করেছেন। শুরুতেই তাঁর উত্থাপিত

প্রশ্নদুটি গভীর ও চমকপ্রদ– হিন্দু সমাজবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যটি কী? এই সমাজ বিন্যাস কি মুক্ত ও অবাধ? ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে এ যাবৎকাল পর্যন্ত এটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজ বিন্যাসের দুটি মৌলিক বিষয়কে থাকতে হবে। প্রথমটি হলো ব্যক্তির লক্ষ্য ব্যক্তিই স্থির করবে। সমাজের কাজ হবে ব্যক্তির সুস্থ বিকাশে সহায়তা করা। দ্বিতীয় আবশ্যিকটি হলো– সমাজের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারিত হতে হবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে।

এটা দেখানোর পর তিনি প্রশ্ন তোলেন যে, কেন একটি মুক্ত সামাজিক বিন্যাসের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর প্রয়োজন। তাঁর কাছে তিনটি বিষয়ই অপরিহার্য। স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ তিনি খুঁজে পেয়েছেন শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসানের মধ্যে। শ্রেণিগত পীড়নের অনুপস্থিতির মধ্যে। তার মতে, প্রকৃত স্বাধীনতা এখনই পাওয়া যাবে যখন বেকারী বা দারিদ্র থাকবে না, সেখানে চাকরি, বাসস্থান বা খাদ্য হারানোর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। (P.86)। এরই পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাও বলেছেন, সরকারি কর্তৃত্বের উৎস হতে হবে শাসিতের সম্মতি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। (পূর্বোক্ত)।

সাম্য ধারণাটির ক্ষেত্রে আম্বেদকর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে নৈতিক সাম্যের উপর বিরাট গুরুত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন। সকলের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এই নৈতিক সাম্য ছাড়া সম্ভব নয়। (পূর্বোক্ত P.84)। মৈত্রী ছাড়া কি একটি সমাজ মুক্ত সমাজবিন্যাসের অধিকারী হতে পারে। এক্ষেত্রে আম্বেদকরের উত্তর– না। কারণ সমাজের সহজ চলন ও বন্ধনকে মৈত্রীই ধরে রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, একে শক্তিশালীও করে থাকে। (P.85)।

এখন প্রশ্ন হলো ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ বিন্যাসে কি এই উপাদানগুলি আছে? এই সমাজ বিন্যাস ব্যক্তিকে কি স্বীকৃতি জানায়? এর উত্তরে তিনি তথ্য ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা কখনই মুক্ত ও অবাধ সমাজ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কারণ সমগ্র ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে বর্ণ-জাতভেদ ব্যবস্থার উপর, ব্যক্তির উপর নয়। তিনি সুসষ্টভাবে বলেছেন, এই সমাজবিন্যাসে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই এটি কখনই মুক্ত সমাজ হতে পারে না। কারণ এই বর্ণ-জাত ব্যবস্থা সমাজকে কেবল খণ্ড-বিখণ্ড করে না, বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকে বাধা দেয় না, মানসিক ও ভৌগোলিক দূরত্বকেও বৃদ্ধি করে।

আম্বেদকর দেখিয়েছেন, কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মগ্রন্থগুলি বর্ণ-জাত-এর মতো অন্যায়, অসভ্য ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য, বৈধতা দানের জন্য যুক্তি দাঁড় করায়। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে যখন চতুর্বর্ণের আবির্ভাব ঐশ্বরিক দেহের নানা স্থান থেকে আবির্ভুত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়, সেখানে স্তরবিন্যস্ত সমাজ স্থাপনই যে শাস্ত্রের লক্ষ্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঈশ্বর চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছে– একথা বলার অর্থ আসলে বর্ণ ব্যবস্থাকে অলঙ্ঘনীয় করে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো একটি যুক্তি এখানে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা হয়েছে তা হলো– বর্ণ-জাত ব্যবস্থা হলো স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক। তাই তাকে মেনে নেওয়াটাই উচিৎ। বিশেষ করে, যেহেতু এটা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট।

(৫)

আম্বেদকরের জীবনের প্রথম দিকের কার্যকলাপের দিকে নজর দিলে, দেখা যাবে যে, তাঁর লক্ষ্য ছিলো হিন্দু ধর্মের সংস্কারসাধন করে, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি উপলব্ধি করেন এটা অসম্ভব। কারণ হিন্দু ধর্ম প্রকৃতপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধর্ম, যার ভিত্তিই হলো অসাম্য, অন্যায় ও পীড়ন। তাই তার কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে বর্ণ-জাতের বিনাশ (Anihilation of Caste, 1936) একে উচ্ছেদ করতে না পারলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এখানে সেই বিশ্লেষণটি আরো খুঁটিয়ে করা হয়েছে। এটি বর্ণ-জাত-এর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি তাঁর সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এক কথায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে চাব্‌কিয়েছেন।

তিনি দেখিয়েছেন সমস্ত ধরণের সাম্যের ধারণাকে নস্যাৎ করে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে একটি অন্যায় ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত বর্ণ-জাতভেদ ব্যবস্থার উপর। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি জাতগত স্তরই চেষ্টা চালায় অন্যের থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করায়। এখানে বৈবাহিক সম্পর্ক সব সময়ই সবর্ণের মধ্যে বা চেষ্টা চালানো হয় উচ্চবর্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করার। অর্থাৎ এখানে একটি দূরত্বায়নের প্রক্রিয়া চলে। সামাজিক ক্ষেত্রে একটি অংশ অন্য অংশকে খাটো বা ছোটো করার প্রচেষ্টা চালায়। দূরত্বায়নের প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকে খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও। উচ্চবর্ণ হিন্দুরা নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত লোকের বাড়িতে খাবার খেতে পারে, যদি সেই বাড়িতে উপযুক্ত কাউকে দিয়ে রান্না করানো হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দিয়ে। ব্রাহ্মণের রান্না সকলে খেতে পারলেও, অস্পৃশ্যর রান্না উচ্চবর্ণভুক্তরা খায় না। পাকা খাবার (ঘি দিয়ে রান্না)র ক্ষেত্রে যতটা ছাড় থাকে

কাঁচা খাদ্যের থেকে ততোটা ছাড় পায় না। (P.95-96)। বর্ণ-জাত ভেদের মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক দূরত্বায়ন তৈরি হয়, তা বর্ণ-জাত ব্যবস্থাকে আরে শক্তিশালী করে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায় (অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়)টিতে তিনি হিন্দু সমাজ বিন্যাসের অনন্য বোঝার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে এখানে তাঁর আলোচনাটিতে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন হিন্দু সমাজ বিন্যাসের তিনটি বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণ রয়েছে-- প্রথমটি মহাপুরুষ পূজা (worship of the superhuman); দ্বিতীয়টি হলো এই সমাজ বিন্যাসকে টিকিয়ে রাখার কৌশল; এবং তৃতীয়ত, স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থা।

জার্মান দার্শনিক নিৎসে যে 'মহাপুরুষে'র আলোচনা করেছেন, তা তাঁর সৃষ্ট কোনো মৌলিক ধারণা নয়, এক্ষেত্রে নিৎসে স্মৃতির কাছেই ঋণী, মনুস্মৃতিতে পাওয়া যাবে হিন্দু সমাজ বিন্যাসে ব্রাহ্মণদের অবস্থানটি হলো সর্বোচ্চ, মহাপুরুষের পর্যায়ে। ব্রাহ্মণদের এই সর্বোচ্চ মর্যাদাকে শক্তিশালী ও বৈধতার কাজটি হয় মনুস্মৃতির মধ্যে দিয়েঃ

১.১৩ ''ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এই ব্রাহ্মণের জন্ম সকল বণের আগে। বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অধিকারী বলে ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী এই ব্রাহ্মণই সমস্ত সৃষ্ট জগতের প্রভু।'' (দত্ত, চৈ.; ২০০৮:৫২)

১.৯৪ ''ব্রহ্মা তপস্য করে দেবলোক ও পিতৃলোকের হব্যকব্য বহনের জন্য এবং জগৎ সংসারের রক্ষার জন্য নিজের মুখ থেকে প্রথমে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করলেন।'' (পূর্বোক্ত)।

১.৯৫ ''দেবতারা যে ব্রাহ্মণের মুখ থেকে সর্বদা হবনীয় দ্রব্য ভোজন করেন এবং যাদের মুখ থেকে পিতৃগণও কব্যদ্রব্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্ন ভোজন করেন এই পৃথিবীতে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ আর কে আছে।'' (পূর্বোক্ত)।

১.৯৬ ''স্থাবর জঙ্গমে পূর্ণ এই চরাচর জগতের মধ্যে যত সৃষ পদার্থ আছে তার মধ্যে যাদের প্রাণ আছে তারাই শ্রেষ্ঠ। প্রাণীদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি আছে তারা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের মধ্যে আবার মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।'' (পূর্বোক্ত)।

১.৯৭ ''ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অধিকারী বিদ্বানরা শ্রেষ্ঠ। বিদ্বানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানে যাঁদের কর্তব্যবুদ্ধি আছে তাঁরা শ্রেষ্ঠ।

কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে আবার যাঁরা বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ। আবার এই অনুধ্যানকারীদের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা শ্রেষ্ঠ।" (পূর্বোক্ত)।

আম্বেদকর মনু স্মৃতি থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে তথাকথিত পবিত্র শাস্ত্র ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করার চেষ্টা করে। যেটা আম্বেদকর এখানে উল্লেখ করেননি, তা হলো, হিন্দু ক্রমোক্ত স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থা রয়েছে, এখানে (১.৯৭) তা প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ স্তরের মধ্যেও রয়েছে আরও স্তর, আরও ক্রমোন্নতা। একটি পিড়ামিডের প্রতিটি ধাপের মধ্যেও রয়েছে অজস্র পিড়ামিড।

ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় মনু অক্লান্ত। আরও একটি কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

১.৯৮ ''ব্রাহ্মণের দেহের উৎপত্তি মাত্রেই তা ধর্মের শাশ্বতী মূর্তি। ধর্মের জন্য উৎপন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করে থাকেন।" (পূর্বোক্ত: ৫২-৫৩)।

একজন আম্বেদকরবাদীর চোখে কাশ্মীর সমস্যা

সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস

ড. আম্বেদকর ১৯৫১ সালের ১০ অক্টোবর নেহেরু মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফার ব্যাখ্যামূলক বর্ণনায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তা আজ স্মরণ করা জরুরি। তিনি বলেছিলেন---''পাকিস্তানের সাথে ঝগড়া আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হয়ে গেছে। আমি এ জিনিস একেবারেই পছন্দ করি না। দু'টি কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। একটা হল কাশ্মীর; আর দ্বিতীয়টা হল পূর্ব বাঙলায় আমাদের মানুষের জীবনের দুঃসহ কষ্ট। অমি মনে করি আমাদের পূর্ব বাঙলার মানুষের সমস্যার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত যে খবর পাচ্ছি, তাতে মনে হয় কাশ্মীরের সমস্যা থেকেও পূর্ব বাঙলার মানুষের অবস্থা আরও বেশি শোচনীয়। সরকার কাশ্মীরের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করছে। আমি মনে করি আমরা একটা অবাস্তব বিষয় নিয়ে লড়াই করে চলেছি। কাশ্মীর প্রশ্নে কে সঠিক আর কে বেঠিক তাই নিয়ে আমরা লড়াই করি। আমার মনে হয় কে সঠিক তা নিয়ে লড়াই না করে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিৎ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ কী তা নির্ধারণ করায়। এটাকেই প্রধান প্রশ্ন ধরে নিয়ে আমার মতে কাশ্মীরকে ভাগ করাই হল এই সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায়। বৌদ্ধ এবং হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল দেওয়া হোক ভারতকে এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল দেওয়া হোক পাকিস্তানকে--- ঠিক ভারত ভাগের ক্ষেত্রে যেমন আমরা করেছি। আমরা যথার্থই কাশ্মীরের মুসলমান প্রধান এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট নই। এটা কাশ্মীরের মুসলমান এবং পাকিস্তানের ব্যাপার। ঐ বিষয় নিয়ে তাঁরা যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিক। অথবা কাশ্মীরকে তিন ভাগে ভাগ করা হোক। একটা যুদ্ধ মুক্ত অঞ্চল, উপত্যকা (শ্রীনগর) এবং জম্মু-লাদাখ এলাকা। এরপর শুধুমাত্র উপত্যকায় গণভোট নেওয়া হোক। প্রস্তাবিত গণভোটের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হল--- সব অঞ্চল মিলে একইসাথে গণভোট হলে

হিন্দু ও বৌদ্ধদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তা যদি করা হয় তাহলে তারা পাকিস্তানে নানা সমস্যার মুখোমুখি হবে, যেমন হচ্ছে পূর্ব বাঙলায়''।

ড. আম্বেদকর আরও বলেছিলেন--- ''নেহেরু সরকারের বিদেশনীতি ভুলে ভরা। সরকারের নীতির ফলে দেশের বাইরে ভারতের কোনো মিত্র নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক শত্রুতামূলক। কাশ্মীরকে জোর করে ধরে রাখলে তাতে দেশের মঙ্গল হবে না; বরং তা দেশের জন্য বিপজ্জনক''। পরিসংখ্যান উল্লেখ করে তিনি বলেন--- ''১৯৫০-৫১ সালে ভারতের মোট সরকারি আয় (reveneu) ছিল ৩৫০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল সামরিক খাতে। যার ফলে দেশের কোটি কোটি অভুক্ত জনতার খাদ্য জোগাড় করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং দেশের শিল্পায়ন এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে'' (ড. আম্বেদকর রচনাবলী ১৪তম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ)। কাশ্মীর প্রশ্নে সরকারের ভুলনীতির মাশুল আজও এদেশের জনগণকেই গুনতে হচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্তান এ পর্যন্ত তিনবার যুদ্ধ লড়েছে। ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে। (৪র্থ বার কারগিল সেক্টরে লড়াই হয়েছে ১৯৯৯ সালে)। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে এই চরম শত্রুতার মূল কারণ হল কাশ্মীর। অথচ কাশ্মীর সমস্যা দুই দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো সমস্যাই নয়। কাশ্মীরের সাথে ঐতিহাসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জনগণের কোনো নাড়ীর যোগাযোগ কোনোকালেই ছিল না। আজও ভারত বা পাকিস্তান কোনো দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনের সাথে কাশ্মীরের যোগসূত্রতা প্রায় নেই বললেই চলে। তাহলেও কাশ্মীরের জন্য দু'দেশের সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা খাতে মোট জাতীয় আয়ের ৩.৫ শতাংশ খরচ করছে ভারত, যা দেশের মোট বাজেটের বরাদ্দের এক পঞ্চমাংশ। তার সাথে পাল্লা দিতে পাকিস্তান খরচ করছে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ৬.৫ শতাংশ, যার দায়ভাগ শেষ বিচারে দুই দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হচ্ছে। আর এই সুযোগে শিল্পপতি, নেতা-মন্ত্রীরা দু'হাতে কামিয়ে নিচ্ছেন। পাশাপাশি সীমান্ত সমস্যামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা খাতে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ১.৩ শতাংশ খরচ করছে।

শুধু কাশ্মীর নয়, দেশের যে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পাকিস্তানের ইস্পাহানি, বাওয়ানি, আদমজী প্রভৃতি বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী বা ভারতের আঞ্জ স্বানি, টাটা, বিড়লাদের পণ্যসামগ্রীর বাজার সংকুচিত হয়, শোষণ-মুনাফায় টান পড়ে--- ফলে কাশ্মীর বা নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম নিয়ে তাদের চিৎকার-চেঁচামেটির মানে বোঝা যায়। কিন্তু ঐসব রাজ্যের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি, খুন ও বর্বরতা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ঐসব রাজ্যগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা বা না রাখার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের সুবিধা বা অসুবিধার কী হেরফের হয়, তা বোঝা ভার। অথচ বাস্তব ঘটনা হলো--- দুই দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে কাশ্মীর। কাশ্মীর বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের সাধারণ মানুষের অঙ্গচ্ছেদ।

প্রতিবেশীর দুঃখ নিয়ে ভাবার সময় নেই। ৬০ বছরের বৃদ্ধাকে(গড়িয়ায়) একটা পুরনো কাপড় চুরি করায় পিটিয়ে খুন করতে হাত কাঁপে না। অথচ কাশ্মীরের জন্য যেন জীবনপণ। বিকৃত দেশপ্রেম, অলীক জাতীয়তাবোধে মানুষ অন্ধ! কেন এটা হলো সে প্রশ্নের কোনো সদুত্তর জনসাধারণের জানা না থাকলেও এটা আজ চরম বাস্তব। সমস্ত শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সম্পত্তির পাহারাদার কংগ্রেস, বিজেপি, জনতা, সিপিএম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষাকে জনগণের নিজেদের সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষা হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছে। হাজারো সমস্যা জর্জরিত ভারত-পাকিস্তানের জনগণ তাঁদের নানা সমস্যা নিয়ে যখন ভাবতে চেষ্টা করেছে, তখনই কাশ্মীর সমস্যাকে আরও উস্কে দিয়ে তারা উভয় দেশের জনগণের দৃষ্টিকে পাহাড়ী উপত্যকার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আগামী দিনেও তারা একই ছকে খেলার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। এ অবস্থায় ইতিহাসকেই দাঁড়াতে হবে ভ্রান্ত আবেগের মুখোমুখি। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে হবে মিথ্যা প্রচারের মোহজাল, জনগণকে টেনে আনতে হবে সত্যের আলোকে, দেখাতে হবে সঠিক পথ।

ইতিহাস

সম্রাট অশোক কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন। কুশান রাজার রাজত্বকাল দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সময়ে কাশ্মীরে হিন্দুধর্মের আধিপত্য ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে দুর্লভ বর্ধন কারকোটা রাজবংশের পত্তন করেন। আর ৮৫৫ সাল নাগাদ কাশ্মীরে উৎপল

রাজবংশের সূচনা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তান্ত্রিন, যশকরা ও পরভা গুপ্ত রাজত্ব করেন।

বিধবা ভিট্টা রাজত্ব করেন ১০০৩ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ে সুলতান মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কিন্তু কাশ্মীর জয় করতে তিনি ব্যর্থ হন। অতঃপর ১৩৪৬ সালের শেষ হিন্দু রাজা উদিয়ান দেব তাঁরই মুসলমান মন্ত্রী আমির শাহ্ কর্তৃক নিহত হন বলে জানা যায়। এই সময় থেকে আমির শাহ্র বংশানুক্রমিক শাসনের শুরু হয় এবং এই শাসন ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর মোগল সম্রাট আকবর কাশ্মীর জয় করেছিলেন। কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। ১৭৫৭ সালে আহ্মদ শাহ্ দুরানি কাশ্মীর জয় করে একে আফগানিস্তানের অঙ্গীভূত করেন।

হিন্দু প্রধান কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করলেও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য খ র্ব করতে পারেনি। কিন্তু আমির শাহ্র আমল থেকে কাশ্মীরে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনায় ইসলামের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। সম্রাট আকবর কাশ্মীর জয় করার আগেই ঐ দেশে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য কাশ্মীরের মুসলমান বিদেশ থেকে আগত ঐ দেশেরই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নাা কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

১৮১৯ সাল থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর রণজিৎ সিংহের দখলে ছিল। অর্থাৎ প্রথম শিখযুদ্ধ পযন্ত কাশ্মীরের উপর তার দখল কায়েম ছিল। যুদ্ধে জয়ী ব্রিটিশদের আর্থিক দায় মেটানোর জন্য মাত্র এক কোটিরও কম টাকায় তিনি গুলাব সিংহের নিকট কাশ্মীর বিক্রি করে দেন বলে জানা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে গুলাব সিং সরাসরি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকেই জম্মু ও কাশ্মীর কিনে নিয়েছিলেন।

গুলাব সিং ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ঐ চুক্তির ফলে তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীন শাসকরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি পরবর্তীকালে বৌদ্ধপ্রধান লাদাখ জয় করেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গুলাব সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার রূপে পর্যায়ক্রমে রণবীর সিং (১৮৫৭-১৮৮৫), প্রতাপ সিং (১৮৮৫-১৯২৫) এবং হরি সিং ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ব্রিটিশ পরবর্তীকালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা বিভাজন পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটি

পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কাশ্মীর সেই প্রাচীনকাল থেকেই একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এমনকি ব্রিটিশ রাজত্বকাল জুড়েও কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারত ইংরেজ শাসনমুক্ত হওয়ার পর যখন জওহরলাল নেহেরু মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তখন কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ নয়, স্বাধীন দেশ। হরি সিং সে দেশের স্বাধীন রাজা।

১৯৪৭ সালের ২০ অক্টোবর পাকিস্তান সরকারের মদতে পাকিস্তানের পাঠান উপজাতিরা কাশ্মীরে হানা দেয় এবং রাজধানী শ্রীনগরের উপর দখলদারি কায়েম করার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় হরি সিং জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লাহর পরামর্শক্রমে ভারতের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান।

তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন হরি সিং-এর আবেদনের জবাবে জানান যে ''ভারতীয় ইউনিয়নে রাজ্যটি যোগ না দিলে কোনোরকম সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়''।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহারাজা হরি সিং যখন ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে দোদুল্যমান, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থাভাজন ন্যাশনাল কনফারেন্স তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী ছিল এবং তারা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। ন্যাশনাল কনফারেন্স মনে করত পাকিস্তানের থেকে ভারতে যোগ দিলে তাদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

ভারত সরকার ও ন্যাশনাল কনফারেন্স এই দুই শক্তির চাপের কাছে নতিস্বীকার করে হরি সিং ভারতের সঙ্গে যোগদান করতে সম্মত হন এবং ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে শর্তযুক্ত সংযোজন দলিলে স্বাক্ষর করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়।

গভর্নর জেনারেল সংযোজনের দলিলে স্বীকৃতি দেন এবং একইসাথে জানিয়ে দেন যে ''ভারতের সাথে সংযোজনের ঐ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়। আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব সংযোজনের প্রশ্নটি জনগণের ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত হবে''। পরে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি একই অবস্থান পুনরায় ব্যক্ত করেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন,

''কাশ্মীরের সংযোজনের প্রশ্নটি অপরিবর্তনীয় নয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে''--- যা আজও হয়ে ওঠেনি। ১৯৫৭ সাল থেকে কাশ্মীর বিষয়ে ভারতের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। সেই সময় থেকে নানা অজুহাত খাড়া করে বলা হচ্ছে--- কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

হরি সিং-এর সম্মতি পর ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। কাশ্মীরের প্রায় চারভাগের তিনভাগ ভারতীয় সৈন্যরা এবং বাকী এক ভাগ পাকিস্তানিরা দখলে আনতে সক্ষম হয়। যে অবস্থা আজও বলবৎ আছে।

৩৭০ ধারার জন্ম

ভারত রাষ্ট্রের সাথে কাশ্মীরের যোগ দেবার পক্ষে হরি সিং স্বাক্ষর করেছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর। শর্তসাপেক্ষে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। ঠিক হয় কাশ্মীরের শুধুমাত্র---

১। প্রতিরক্ষা

২। বিদেশ

৩। যোগাযোগ

মাত্র এই তিনটি বিষয় ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সিদ্ধান্ত হয় কাশ্মীর সরকারের প্রধানকে অন্যান্য রাজ্যের মত মুখ্যমন্ত্রী বলা যাবে না। তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীরে কোনো রাজ্যপাল নিয়োগ করার অধিকার রাষ্ট্রপতির থাকবে না। তবে কাশ্মীরের পার্লামেন্ট তাদের নিজেদের রাজ্যপাল নির্বাচিত করবে, রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র তা অনুমোদন করবেন। শেখ আবদুল্লাহ-র জনপ্রিয় সরকার ১৯৫২ সালে হরি সিং-এর পুত্র করণ সিংকে প্রথম রাজ্যপাল নির্বাচিত করে ও রাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক অবলুপ্তি ঘটায়।

ভারত এবং কাশ্মীর--- উভয়পক্ষ সম্মত হয় যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে কোনো আইন/বিল পাশ হলে তা কাশ্মীরে প্রয়োগ করা যাবে না যতক্ষণ না কাশ্মীরের পার্লামেন্ট তা অনুমোদন করে। ইচ্ছা করলে কাশ্মীরের পার্লামেন্ট ভারতীয় পার্লামেন্টের আইন/বিলকে বাতিল করার অধিকারী ছিল। তাছাড়াও কাশ্মীরে অ-কাশ্মীরি কেউ জমি-জায়গা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না ইত্যাদি আরও কিছু শর্ত।

যদিও জমি কেনা ও স্থায়ীভাবে বাস করার ব্যাপারটি নিয়ে জনমনে সম্পূর্ণ

একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়ে আছে। ভারতীয় জনগণ এ প্রশ্নে কাশ্মীরের মুসলমান জনগণকে দায়ী করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল--- ডোগরা রাজা হরি সিং-এর পিতা প্রতাপ সিং ১৯২০-র দশকে বাইরে থেকে নিজেদের লোক এনে কাশ্মীরে বসাতে শুরু করেন। তখন কাশ্মীরের সম্পত্তিবান শ্রেণী, কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাইরে থেকে নিজ সম্প্রদায়ের লোক এনে কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসানোর জন্য রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। নিজের অবস্থান দৃঢ় করাই ছিল রাজার লক্ষ্য। যার ফলে কাশ্মীরে বাইরের মানুষের জমি কেনা ও স্থায়ীভাবে বসবাসের উপর নিষেধাজ্ঞা চালু হয় এবং এর ফলে কাশ্মীরি পণ্ডিতরাই লাভবান হন।

এসবই ছিল কাশ্মীরের ভারতভুক্তির শর্তাবলী। বলাই বাহুল্য একপক্ষ এই চুক্তি লঙ্ঘন করলে অন্যপক্ষের সেই চুক্তি মেনে চলার কোনো বাধ্যবাধকতা আর থাকে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন কাশ্মীরের অপর এক অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগদানের প্রশ্নেও অনুরূপ শর্ত নির্দিষ্ট হয়েছিল। পাকিস্তান সরকারও বহুক্ষেত্রে শর্ত লঙ্ঘন করলেও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধান আজও প্রধানমন্ত্রী, তিনি সর্দার আব্দুল কায়ুম খাঁ।

এসব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ভারতের পক্ষে জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ ও গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এবং কাশ্মীরের পক্ষে শেখ আবদুল্লাহ ও মীর্জা আফজল বেগ ১৯৪৯ সালের মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলোচনা চালান এবং সংবিধানে ৩৭০ ধারা রাখার পক্ষে একমত হন। পরবর্তীকালে কাশ্মীর থেকে চারজন নির্বাচিত প্রতিনিধি যথাক্রমে শেখ আবদুল্লাহ, মীর্জা আফজল বেগ, মৌলানা মাসদী এবং চৌধুরী এম সফি ভারতীয় সংবিধান পরিষদে যোগ দেন এবং সংবিধানে ৩৭০ ধারা গৃহীত হয়। তাই একদিক দিয়ে ভাবলে বলতে হয়--- ৩৭০ ধারা বিলোপ বা প্রত্যাহারের দাবি যারা তুলছেন, তারা কাশ্মীরের ভারতের সাথে যুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা ও যুক্তিটাকে একেবারেই নস্যাৎ করে দিচ্ছেন।

পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের দাবি করেন। জবাবে ১৯৫৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি শেখ আবদুল্লাহ শ্রীমুখার্জীকে এক চিঠি লিখে জানান--- ''কাশ্মীরের ঐ বিশেষ অবস্থান যখন ঠিক হয় তখন আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাই, এই দাবি করার কোনো আইনি বা নৈতিক অধিকার আপনার নেই''। সে চিঠির কোনো সদুত্তর শ্রীমুখার্জী

দিতে পারেননি।

৩৭০ ধারা নিয়ে সমস্যা আজ সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৬৪ সালে এই ধারা নিয়ে সংসদে জোর বিতর্ক হয়েছিল। ঐ সালের ৪ ডিসেম্বর তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা বিতর্কে অংশগ্রহণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন---''যাঁরা ভাবছেন ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নিলেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাঁরা ভুল করছেন। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নিলেও সংবিধানের অন্যান্য সমস্ত ধারা কাশ্মীরে প্রয়োগ করা যাবে না''।

সাংবিধানিক অবস্থান পর্যালোচনা করলেই নন্দাজীর কথার গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়। সংবিধানের ৩৬৮ ধারায় সংবিধানে সংযোজনের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে কোনো সংযোজনী গ্রাহ্য হবে না বলে উল্লেখ আছে। একমাত্র যদি রাষ্ট্রপতির কোনো নির্দেশ ৩৭০ ধারার বিরোধী হয় তাহলেই তা করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সমস্যা হল রাষ্ট্রপতির এ জাতীয় কোনো ঘোষণার আগে ঐ রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। রাজ্য সরকার অনুমতি না দিলে রাষ্ট্রপতি তা করতে পারবেন না।

অনেকের ধারণা ৩৭০ ধারা জোরে একমাত্র কাশ্মীরের একটি বিশেষ অবস্থান আছে। এই ধারণাও বেঠিক। সংবিধানের ৩৭১ বি ধারায় আসামের উপজাতি এলাকায়, ৩৭১ সি ধারা বলে মণিপুরে, ৩৭১ ডি ধারা বলে অন্ধ্রপ্রদেশে, ৩৭১ এফ ধারা বলে সিকিমে এবং ৩৭১ এইচ ধারা বলে অরুণাচল প্রদেশকে কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ঐসব ক্ষেত্রেও সেসব রাজ্যের বিধানসভা না চাইলে এই সমস্ত ধারার কোনো পরিবর্তন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

তাই, একথা আমাদের বুঝতে হবে, শুধুমাত্র ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের দাবি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্য রাজ্যগুলির বিশেষ সুবিধা নিয়ে যখন কথা উঠছে না, তখন কাশ্মীর প্রশ্নটি নিয়ে এতটা হৈচৈ করার গূঢ় রহস্য কী? গণ্ডগোল, খুনোখুনি, উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ শুধু কাশ্মীরে নয়, অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যেও দীর্ঘকাল ধরে একই ধরনের সমস্যা চলছেই। তবে কাশ্মীর নিয়ে প্রচার বেশি একথা ঠিক। কিন্তু আসাম, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিও যে স্রেফ বন্দুকের জোরে ভারতের অঙ্গ এ কথাটিও সমান সঠিক। ঐসব রাজ্যগুলি থেকে ১৯৪৭ সালের পর থেকে একদিনের

জন্যও সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়নি। আজও একটি দিনের জন্য ঐসব রাজ্যগুলি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলে রাজ্যগুলি আর ভারতের অঙ্গ থাকে না। পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ভারতের সাথে ধরে রাখা হয়েছে। কী ধরণের অত্যাচার করা হয় ঐসব রাজ্যের আদিবাসী মানুষের ওপর তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মিজোরামে বর্তমানে একটি নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা মিংপা জনগোষ্ঠী নামে পরিচিত। মিজো মায়েদের গর্ভে পাঞ্জাবী সেনাদের ঔরসজাত জারজ সন্তান তাঁরা। বলাৎকারের ফসল ঐসব সন্তানের পিতৃত্ব স্বাভাবিক কারণেই সেনারা স্বীকার করে না। তাঁরা আজ একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী। এ হলো ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐক্যবদ্ধ ভারতের আসল চেহারা। এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার, এমনকি মি. গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিকেও এতটুকু মূল্য দেয়নি।

১৯৪৬ সাল। স্বাধীনতা বিষয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা শুরু করে। তখন নাগা নেতা জেড. এ ফিজো প্রতিবাদ করে বলেছিলেন--- ''নাগারা ভারতীয় নয়, তাই তাঁদের ভাগ্য নিয়ে কোনো কথা বলার অধিকার কংগ্রেসের নেই''। মি. গান্ধী ফিজোকে বলেছিলেন, ''নাগাল্যাণ্ড তোমাদের এবং আমাদেরও; কিন্তু তোমরা নাগারা যদি বলো যে আমাদের কোনো অধিকার নেই, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কোনো শক্তি তোমাদের জোর করে ভারতরাষ্ট্রে যুক্ত করবে না''।

তাহলেও উত্তরপূর্ব ভারত থেকে কাশ্মীরের অবস্থা অনেকটাই আলাদা। কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি উভয়ই ঐতিহাসিকভাবে ভারতের অঙ্গ না হলেও অন্তত কাশ্মীরের জনগণ একদিন ভারতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন আপন ইচ্ছায়। নিজাম স্বাধীন রাষ্ট্র চাইলেও হায়দ্রাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণ ভারতে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আর কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিং-এর ইচ্ছা না থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণ ভারতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু আজ তাঁরা কেন মনেপ্রাণে ভারত বিরোধী? কে দায়ী এর জন্য! কাশ্মীরের জনগণ, না ভারত সরকার অথবা অন্য কোনো স্বার্থ?

অকাশ্মীরি গুলাব সিং থেকে হরি সিং পর্যন্ত সব রাজাই ছিলেন হিন্দু। ফলে জমির মালিকানাও মূলত ছিল হিন্দু জমিদারদের হাতে, পণ্ডিতদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য কাশ্মীর--- যেখানে আমূল ভূ

মিসংস্কার নীতি প্রথম সফলভাবে কার্যকরী হয়। জমিদারদের সমস্ত জমি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কৃষকদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হয়। শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে বাবাসাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকরের কৃষিনীতি বাস্তবায়িত হয় একমাত্র কাশ্মীরে। তার ফলে ভূমিসংস্কারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জমিদাররা নিজেদের জমিদার পরিচয়কে আড়াল করে হিন্দু পরিচয় বড় করে তুলে ধরেন এবং হিন্দু জমিদারশ্রেণি তাঁদের সামন্ত স্বার্থ থেকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্ত ধীরে ধীরে তার ডালপালা বিস্তার শুরু করে।

জমিদাররা তাঁদের সংগঠন 'অল জম্মু ও কাশ্মীর হিন্দুসভা' এবং 'জম্মু ও কাশ্মীর প্রজা পরিষদ' গঠন করে। হরি সিং-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তার পুত্র করণ সিং-এর তৎপরতায় এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সহযোগিতায় পুরনো জমিদার শ্রেণি কাশ্মীরের অনুর্বর মাটিতে জলসিঞ্চন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে বড় করে তোলে।

এ ব্যাপারে কাশ্মীরের সাথে বাংলার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'কৃষক সভার গতি ও বিকাশ' নামে ১৯৪৩ সালের একটি লেখায় কৃষক সভার অন্যতম নেতা মনসুর হাবিবুল্লাহ বলেন, ''বাঙলার শ্রেণি বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র জমিদার ও কৃষক এবং মহাজন ও খাতক। অনেক ক্ষেত্রে জমিদার-মহাজন এবং কৃষক-খাতক মিলে গিয়ে দু'টি মাত্র বিরোধী শ্রেণি হয়ে পড়ে। জমিদার ও মহাজনদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশি এবং কৃষক ও খাতকের মধ্যে মুসলমান খুব বেশি। তার ফলে শ্রেণি-বিরোধের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রূপ ফুটে বেরোয়। তাই, শ্রেণি-বিরোধ ও শ্রেণি-দাবিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দাবি বলে প্রচার করা হয়। ... এই বিরোধ অশিক্ষিত মুসলমান কৃষক ও অশিক্ষিত নীচুবর্ণের হিন্দু কৃষকদের মধ্যে নেই। জমিদার-কৃষক বা মহাজন-খাতক বিরোধ নিতান্তই শ্রেণি-বিরোধ''।

শ্রী করণ সিং পরবর্তীকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্ম দেন। পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেস সরকার তাঁকে মার্কিন দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে। আর সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীর সমস্যা মেটানোর জন্য করণ সিং-কেই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছেন। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, সেদিনের সেই ভারতীয় জনসঙ্ঘ আজকের বিজেপি--- যে বিজেপি কাশ্মীর ও কাশ্মীরিদের সমস্যায় অত্যন্ত ব্যথিত বলে দাবি করে, আর কাশ্মীরি জমিদারশ্রেণি উদ্বাস্তু পণ্ডিতদের

জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু কে না জানে ১৯৯০ সালে জগমোহন রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পর তার প্ররোচনায় ঐ বছরের ১ মার্চ থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা দলে দলে কাশ্মীর ছেড়ে ভারতে চলে আসেন। কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা মুসলমানদের অত্যাচারে তারা ভিটেমাটি ত্যাগ করেননি।

ভারত সরকার একের পর এক কাশ্মীরি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৫ এবং ১৯৮৬ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কেড়ে নিয়েছে কাশ্মীরি জনগণের বিশেষ অধিকার। কাশ্মীরের জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লাহকে বছরের পর বছর জেলে আটক করে রেখে কংগ্রেসের তাঁবেদার সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে তার মাধ্যমে এই কাজ করা হয়েছে। আজ ৩৭০ ধারার নাম ছাড়া বাকি বিশেষ কিছু নেই। এর ফলে কাশ্মীরি জনগণের ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসের শেষ বিন্দুটিও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আজ আছে শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, সন্দেহ আর শত্রুতা।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক শ্রেণি ও নেতৃবৃন্দ অ-বর্ণহিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষকে এতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়। নিজেদের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। একথা ভারত ভাগের জন্য যেমন ঠিক, কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও সমান ঠিক। আর আগামীদিনে নিজেদের বর্ণ এবং শ্রেণিস্বার্থে তাঁরা যে ভারতবর্ষকে আবারও টুকরো টুকরো করবে তাতে সামান্যতম সন্দেহ থাকার কোনো অবকাশ নেই।

জনপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক ন্যাশনাল কনফারেন্সের ক্ষমতা খর্ব করতে কংগ্রেস মদত জোগায় জামাত-ই-ইসলামির মত মুসলমান সংগঠনকে। সাতের দশকের শুরুতে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের মদতেই জামাত পাঁচটি আসন দখল করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের মুসলমান জনগণ কোনোদিন মুসলিম লীগ বা জামাতের মত মুসলমান সংগঠনকে পাত্তা দেয়নি। কাশ্মীরের মাটিতে তাই কখনো ঘটেনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গা না হবার কারণ হিসাবে হিন্দুরা ওখানে একেবারেই দুর্বল বলে যা বলা হয় তা ঠিক নয়। সম্পদশালী হিন্দুরা কাশ্মীরে যথেষ্ট দাপটেই বাস করেন।

কংগ্রেস ধীরে ধীরে কাশ্মীরে হিন্দু মৌলবাদের জমি প্রস্তুত করে। অচিরেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়। আর এস এস-এর সদর্প উপস্থিতি মুসলমান জনগণের মধ্যে

বৈরিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, যার পরিণতি রূপ আজকের বিদ্রোহী, রক্তাক্ত ও ধর্ষিত কাশ্মীর।

বর্তমান কাশ্মীর

কয়েক বছর আগে বিখ্যাত মানবতাবাদী নেত্রী সুহাসিনী মূলের নেতৃত্বে একটি কমিশন কাশ্মীর পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট পেশ করে এক কথায় তা ভয়াবহ। তিনি বলেন, ''আমরা ১০০০ নারীর সাথে কথা বলেছি যার মধ্যে একজনও ছিলেন না যিনি সেনাবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিতা নন, তাঁদের মধ্যে এক বড় অংশ ধর্ষিতা''।

অ্যাম্‌নেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি একটি হিসাব দাখিল করেছে নাম, ঠিকানা ও পেশা সহকারে। তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে পিটিয়ে মারা হয়েছে ৭১৫ জন ব্যক্তিকে। বলাই বাহুল্য এই সংখ্যা প্রকৃত তথ্যের কাছাকাছিও নয় কারণ নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মৃত ব্যক্তির লাশ প্রায়শই গুম করে দেওয়া হয়। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র উল্লেখ করে ঐ আন্তর্জাতিক সংস্থা জানাচ্ছে--- ১৯৮৯ সালের পর থেকে কাশ্মীরে ১৭০০০ নিরপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশু মারা গেছেন নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ১৯৯০ সাল থেকে এপর্যন্ত ৩৩০৭ জন জঙ্গী নিহত হয়েছেন।

১৯৯৩ সালের ৬ জানুয়ারি সোপোর শহরে বি এস এফ গুলি করে খুন করে ৪৫ জন নর-নারীকে। ঐ বছরের অক্টোবরে বিজবেহারা শহরে বি এস এফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে আরও ৩৭ জন নিরস্ত্র মানুষকে।

গণধর্ষণের বহু ঘটনার মধ্যে একটি হল ১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে কুনান পোশপোরা গ্রামের ঘটনা। ৮০ থেকে ১৩ বছর বয়সী ২৩ জন নারীকে ৪র্থ রাজপুত রাইফেলস্-এর সৈন্যরা বন্দুক দেখিয়ে ধর্ষণ করে। 'উইমেন্স ইনিসিয়েটিভ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ১৯৯৪ সালের জুন মাসে ঐ গ্রাম পরিদর্শন করে জানান---''ঐ গ্রামে গত তিন বছর কোনো বিবাহ হয়নি। ধর্ষিতা ও অধর্ষিতা সব বালিকাই অবিবাহিতা। সমস্ত ধর্ষিতা বিবাহিতাকে তাদের স্বামী পরিত্যাগ করেছেন। ধর্ষিতাদের দু'জন আত্মহত্যা করেছেন। ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা একজন মহিলাকে ৮জন সৈনিক ধর্ষণ করার তিনদিন পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। নবজাতকের বাম বাহু ভেঙে গিয়েছিল''।

এ জাতীয় হাজার হাজার বর্বর অপরাধের কারণে মহামান্য ভারত সরকারের সংস্কৃতিবান উচ্চ বর্ণহিন্দু প্রশাসন এ পর্যন্ত ৭০ জন অপরাধীর কারাদণ্ড দিয়েছে। তারা হলেন ১৫ জন সেনা, ৪০ জন বি এস এফ এবং ১৫ জন সি আর পি এফ কর্মী। ৭০ জনের মধ্যে ৫৫ জনের কারাদণ্ড এক বছরের কম, বাকীদের এক বছর বা তার বেশি মেয়াদের কারাদণ্ড হয়েছে।

প্রচার করা হচ্ছে কাশ্মীরীরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। একথা ঠিক পাকিস্তানপন্থী জঙ্গী গোষ্ঠী সেখানে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাশ্মীরী জনগণের প্রধান অংশের নেতৃত্বে আছে জেকেএলএফ যাঁরা আজাদ কাশ্মীরের প্রবক্তা। এমনকি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকেও মুক্ত করে তাঁরা স্বাধীন কাশ্মীর গড়তে চান। জেকেএলএফ সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। যার ফলে তাঁরা আজ ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ অন্যান্য সব প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেট।

যার ফলে আমরা দেখতেপাই ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর জে কে এল এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা মকবুল বাটকে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিতে হয়। তারও আগে ১৯৮৬ সালের ২৫ জুলাই ঐ সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা আমানুল্লাকে লন্ডন থেকে বিতাড়িত করা হয়। ঐ সংগঠনের আঞ্চলিক কমাণ্ডারকে পাকিস্তানপন্থী মুজাহিদিন গোষ্ঠী খুন করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আমানুল্লাহর শান্তি মিছিলে গুলি চালিয়ে ১২ জন জেকেএলএফ সমর্থককে খুন করা হয় এবং ৫০০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে কাশ্মীরে।

ভারত সরকার গত কয়েক বছর ধরে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী জেকেএলএফ-কে খতম করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকামী জঙ্গীদের ধ্বংস করে পাকিস্তানপন্থী জঙ্গীদের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। কারণ তাহলে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট গোষ্ঠীকে সুস্পষ্টভাবে বিদেশি শত্রু হিসাবে প্রচার করা সহজ হয়। এইসব জঘন্য ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে বিরাট সংখ্যককে পাকিস্তানে চলে যেতে এবং সামরিক ট্রেনিং নিয়ে কাশ্মীরে ফিরে আসতে বি এস এফ জওয়ানদের একাংশ বাধা দিচ্ছে না। এই বে-আইনি যাতায়াতের জন্য তারা মাথাপিছু ঘুষ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কাশ্মীরের সরকারি কর্মীরা এইসব অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে তুলছেন এবং এ জিনিস বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন। কিন্তু তাতে কেউ কান দেয়নি। আসলে ভারত

সরকার প্রমাণ করতে চাইছে পাকিস্তানের মদত ও হস্তক্ষেপ এবং এভাবে ভারত সরকার বিদেশ ও ভারতীয় জনগণের সমর্থন আদায় করে নেবার চেষ্টা করছে যাতে কাশ্মীরি জনগণের উপর বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসী ও বিশ্ব জনমত সোচ্চার না হয়।

কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পাঞ্জাবের অধিকাংশ জনসাধারণ ইসলাম, বৌদ্ধ, খৃষ্ট বা শিখ যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, তারা মূলতঃ আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের অত্যাচারে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাঁরা সাধারণত উচ্চ-বর্ণহিন্দু নন। তাই যে বর্ণহিন্দু শিক্ষকরা ৬ বছরের অস্পৃশ্য স্কুলছাত্রী ধানাম মারিকে স্কুলের জলপাত্র থেকে জল তুলে খাবার অপরাধে মেরে চোখ কানা করে দেয় (মাদুরা '৯৫), স্কুলের কল থেকে জল খাবার অপরাধে পুরো অস্পৃশ্য বরযাত্রী দলকে পিটিয়ে আধমরা করে হাসপাতালে পাঠায় (গুজরাট '৯৫), ন্যায্য মজুরি দাবি করায় যাঁরা 'হরিজনদের' গণহারে খুন করে ও 'হরিজন' মায়েদের ধর্ষণ করে (বিহার '৯৫) বা চুণী কোটালদের অসহ্য মানসিক অত্যাচার করে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে (পশ্চিমবঙ্গ '৯৩), তাঁরা ঐসব এলাকার অ-বর্ণ ভূমিপুত্রদের উপর বর্বর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাবে এটা অস্বাভাবিক নয় বা নতুন কিছু নয়।

তাই আমরা দেখি, রামমনোহর লোহিয়া নাগাল্যাণ্ড ঘুরে এসে যখন মন্তব্য করেন--- ''সৈন্যবাহিনী ঐসব এলাকায় হত্যা ও ধর্ষণের তাণ্ডবে মেতে উঠেছে'', তখন বিদ্রোহ দমনের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রগতিবাদী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নির্বিকার চিত্তে লোকসভায় জানান---''এই বিদ্রোহ দমনের কাজে রাজ্যের ব্যয় হয়েছে দেড় কোটি টাকা এবং সেনাবাহিনীর হাতে মারা পড়েছেন ১৬০০ নিরীহ নাগরিক''। সরকারের যুক্তি হল---''দোষী সেনাদের শাস্তি দিলে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যাবে এবং জঙ্গীরা উৎসাহিত হবে''। তাই দেশের নাগরিকদের জীবন ও সম্মান থেকে সেনাবাহিনীর 'বিকৃত মনোবল' রক্ষার দায়িত্ব যে সরকারের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সম্পর্কে দেশবাসীকে নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা যেন ভুলে না যাই কাশ্মীরে পাশবিক অত্যাচার চালানোর ফলে এদেশের সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর যে নৈতিক অধঃপতন ঘটছে, তা এক অপূরণীয় ক্ষতি।

জঙ্গীদের ঐসব বর্বরতাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করতে হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সরকারি সন্ত্রাস হলো 'কারণ' যার 'ফলাফল' আজকের জঙ্গী

সন্ত্রাস। কারণ দূর না হলে বলপ্রয়োগ করে ফলাফল অর্থাৎ সন্ত্রাস সাময়িকভাবে স্তিমিত হলেও বন্ধ হবে না।

আর দলিত, গণতান্ত্রিক ও সমানাধিকারে বিশ্বাসী মানুষ যেন ভুলে না যান যে পাহাড়ি মানুষগুলি মূলত আদিবাসী ও দলিত। ওদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লক্ষ্যে সংগ্রামকে বিরোধিতা করলে ঝাড়খণ্ড, গোর্খা, নাগা, মিজো প্রভৃতি জাতিসত্ত্বার আন্দোলন তথা দলিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করার কোনো নৈতিক অধিকার আর থাকে না।

ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রশ্নে ড. আম্বেদকর কতকগুলি কথা বলেছিলেন। অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আরেকবার তা আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন---''আলাদা পাকিস্তানের দাবিতে মুসলমানদের ভূমিকার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। তার মধ্যে আছে কিছু বাধ্যবাধকতা ও মুসলমানদের অনমনীয় মনোভাব। মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির যুক্তিগুলির দুর্বলতা আমি জানি। তথাপি, আমি এই মত পোষণ করি যে তারা যদি পাকিস্তানের দাবিতে অনড় থাকে তাহলে এটা তাদের ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নেই। ... যে শাসনতন্ত্র নির্দিষ্ট অংশের মনোভাবের প্রবল বিরোধিতা করে, তা বিপ্লব ডেকে না এনে দুর্ভাগ্য ডেকে আনে''।

তিনি বলেন---'' ধরা যাক, অবিভক্ত ভারতের শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য সমস্ত ধরনের আইনি ব্যবস্থা রাখা হল। কিন্তু যদি মুসলমানরা বলেন 'নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ; আমরা তোমাদের দ্বারা শাসিত হতে রাজি নই। বা তারা যদি আইনসভা বয়কট করে, আইন মানতে অস্বীকার করে, রাষ্ট্রীয় কর দিতে বাধা দেয়, তখন কি হবে? হিন্দুরা কি বেয়নেট দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য আদায় করতে প্রস্তুত আছে? স্বরাজ কি জনগণকে সেবা করার জন্য নাকি হিন্দুদের মুসলমানদের উপর খবরদারি করার বা মুসলমানদের হিন্দুদের উপর আধিপত্য করার জন্য? স্বরাজ মানে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য একটি জনগণের সরকার। এটাই হল স্বরাজের মূল ভিত্তি এবং সার্থকতা। স্বরাজ যদি এমন এক যুগের সূচনা করে যেখানে হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বা একদল অন্যদলকে পদানত করার পরিকল্পনা করে তাহলে সে স্বরাজের আমাদের প্রয়োজন কি এবং গণতান্ত্রিক জাতিসমূহ এমন স্বরাজকে কেন স্বাগত জানাবে?

এমন স্বরাজ হবে এক মৃত্যু ফাঁদ, বিরাট প্রতারণা, এক মস্ত ভুল'' (*আম্বেদকর রচনাবলী* ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩৬)।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে দেশবাসী কাশ্মীরী জনগণকে শত্রু ভাবতে শিখেছেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওদের উপর সেনাবাহিনীর বর্বর নির্যাতন বন্ধ করতে সরকারকে বাধ্য করা দেশবাসীর এই মুহূর্তের আশু কর্তব্য। দেশবাসীকে আওয়াজ তুলতে হবে, ৩ জুলাই ১৯৭২-এর সিমলা চুক্তির বাহানা নয়, বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের গণতান্ত্রিক নির্দেশ শিরোধার্য করে এবং ভারত ও পাকিস্তানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের ল কমিশন কর্তৃক ১৯৪৯-এর ৫ জানুয়ারীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত (এস/১১৯৬) অনুযায়ী নিরপেক্ষ গণভোটের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ঘোষিত হোক। কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার কাশ্মীরের জনগণকেই দেওয়া হোক।

সৌজন্য : নীল আকাশ

অজগর

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

রসায়নের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী সুনীল কুমার রায়-এর একটি উক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আমার গবেষণার দু-একটি ক্ষেত্রে। এখানে তার একটি নিয়ে আলোচনা করব– ভারত সেবাশ্রম সংঘ বনাম প্রান্তিক জাতির মুক্তি। (উন্নয়নও)

গবেষণার বিভিন্ন সময়ে আমি কিছু দলিত সংগঠন ও দলিত রেসপেক্টেড-দের থেকে একটি উচ্চবর্ণ-এর সংগঠনের কথা বারবার শুনি। সেটি হল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। মোটামুটি বক্তব্যটা এইরকম: কোনো উচ্চবর্ণীয় সংগঠন যদি দলিত স্বার্থের জন্যে 'কাজ' করে থাকে তা হল ভারত সেবাশ্রম সংগঠন। বারবার এই ধরনের কথা শুনতে শুনতে আমার বিশ্বাস জন্মালো যে এই সংঘের উপর গবেষণা প্রয়োজন। যাতায়াত শুরু করি বালিগঞ্জের হেড অফিসে। আর তাদের প্রকাশিত বিভাগ থেকে একটি পুস্তক তালিকা নিয়ে এলাম। সম্ভবত সেদিন বা তার পরের দিন সুনীল রায়-এর সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম। উনি দলিত কথাটির বিপক্ষে বলেন। সেই তর্কে এখন গেলাম না। শুধু এটুকু এখানে বলে রাখি যে 'দলিত' কথাটির বিরোধিতায় উনি যে বিশ্লেষণ দিলেন তা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরে অন্য সংখ্যায় সেই নিয়ে লেখা যেতে পারে।

সেদিনের সাক্ষাৎকারের আলোচনা চলছিল পূর্ববঙ্গে প্রান্তিক জাতির আন্দোলন নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে সুনীল রায় বললেন, ''আমাদের আন্দোলন যতই জোরদার হতে থাকল তত ই একদিক থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্ব আমাদের হাত থেকে আন্দোলনের ওপর কর্তৃত্ব করা আরম্ভ করল আর অপরদিকে প্রণবানন্দ ও তার সংঘ আমাদেরকে অজগড়ের মতো চেপে ধরল। সেই চাপের থেকে বেরোনো খুব কঠিন হয়ে পড়ল। বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ চলতে থাকে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বেশ কয়েকবার সংঘে যাই। দু'জন

মহারাজ ও দু'জন সংঘের অফিস কর্মীদের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নিই। এবং প্রকাশনা বিভাগে খানিক টাকা খরচা করি গাদাখানেক বই কেনার জন্য। ভালো করে যখন প্রকাশনা বিভাগ সার্ভে করলাম তাজ্জব বনে গেলাম। সুনীল রায়-এর উক্তি অজগড়ের ন্যায় চেপে ধরা-- কতটা মারাত্মক আকারে যে সত্যি তা ধরা পড়ল নিদেনপক্ষে ৭৫ শতাংশের বেশি বই'র কার্যত ''জাতি গঠন'' নিয়ে। বহু বইয়ের একদম শুরুতে ই রয়েছে প্রণবানন্দের মূল মন্ত্র ''জাতি গঠন, জাতি গঠন, জাতি গঠন''। এই জাতি গঠনটা কী বিষয় নিয়ে? হিন্দু সংগঠন গড়া। এটি পরিষ্কারভাবে প্রণবানন্দ বলছেন সংঘের মূল কর্ম ও ধর্ম।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের আনুষ্ঠানিক জন্ম ১৯২৪ সালে। তবে প্রণবানন্দ তার কর্ম ও ধর্ম বেশ কিছু বছর আগে প্রায় ১৮৯২ থেকেই শুরু করে দেন। হিন্দুর আন্দোলন, হিন্দু মিলনমন্দির সমন্বয় সংঘের হিন্দু সংগঠন গড়ার মূলস্তম্ভ। কী কাজ ছিল এই মিলন মন্দির ও রক্ষীদলের? অজগরের যা কাজ, সেই কর্ম ও ধর্ম ছিল এই সংগঠনের।

১৯০৫ সালের স্বদেশী ডাককে বয়কট করেন বিভিন্ন প্রান্তিক জাতিগুলি। তাদের মধ্যে পূর্ববাংলার নমশূদ্ররা গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন স্বদেশী যে বর্ণহিন্দুদের আন্দোলন তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বর্ণহিন্দুদের কাছে সবচেয়ে বিপদের সূচনা হল যখন নমশূদ্ররা বিশেষত মুসলমান কৃষকদের সাথে যোগ দিয়ে বর্ণভিত্তিক সমাজের ও জমিদারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার করলেন এই স্বদেশী বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে।

১৮৯২ নাগাদ প্রণবানন্দ হিন্দু সংগঠনের ডাক দিলেন। অস্পৃশ্যতা দূ রীকরণের এক প্রবল যজ্ঞ শুরু করে দিলেন যার কর্মসুচী ও নেতৃত্বে রইলেন সেই বর্ণহিন্দু সমাজ। প্রান্তিক জাতির মধ্যে কিছু অভ্যাস ছিল যেমন একটা মূ ল খাদ্যশষ্য ভাণ্ডার স্থাপন। প্রতিটি স্বচ্ছল প্রান্তিক জাতি পরিবার প্রতি মাসে এই ভাণ্ডারে খাদ্যশস্য কিছু দান করত। বিপদের সময়ে এই ভাণ্ডার থেকে দুস্থ প্রান্তিক জাতির পরিবারদের সাহায্য করা হত।

প্রণবানন্দ এই ধরনের কিছু কাজ হিন্দু সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের আওতায় নিয়ে আসে। স্কুল, নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য বিদ্যালয় এবং সমস্ত 'হিন্দু'-দের জন্য একটি ধর্মসভার আয়োজন করেন। সমিতির দায়িত্ব হয় এসব চালানোর এবং নিয়োগ করা হয় প্রান্তিক জাতির মানুষদের।

রক্ষীদলের কাজ ছিল নমশূদ্র, পৌণ্ড্র, রাজবংশী, বাগদি জাতিদের থেকে

১২-৫০ বছরের যুবক-পুরুষদের নিয়ে সশস্ত্র দল তৈরি। প্রণবানন্দ ঘোষণা করলেন হিন্দু মাত্রেই নাকি সবাই 'স্পর্শের' আওতায় আসে। অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের মধ্যে থাকতে পারে না। তবে অস্পৃশ্য কারা? প্রণবানন্দ জানালেন, সমগ্র অ-হিন্দু অর্থাৎ মুসলমানরা অস্পৃশ্য।

এই করে রক্ষীদল সমগ্র হিন্দুদের রক্ষার দায়িত্ব নিল। মূলদ প্রান্তিক জাতিদের রক্ষার দায়িত্ব। প্রণবানন্দ বা সংঘকে কিন্তু প্রান্তিক জাতির মানুষ সেই দায়িত্ব দেননি। তারাও সামাজিক কার্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। সেটিকে ছিনিয়ে নিল সংঘ ও প্রণবানন্দ। রক্ষীদলের মাধ্যমে ও সমিতির কার্যের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করল ধীরে ধীরে প্রান্তিক জাতি ও মুসলমানদের মধ্যে। সুপরিকল্পিত ভাবে প্রান্তিক জাতির মানুষকে সংঘের আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের দীক্ষা ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা এসব সেই আলোকে সমাজ পুনর্গঠন করা প্রান্তিক জাতির জন্য ছিল অপরিহার্য্য। এবং যা ছিল বর্ণহিন্দু সমাজের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক। সেই ক্ষতিকে রুখতেই প্রণবানন্দের জাতি গঠন হয়ে ওঠে সংঘের মূল মন্ত্র।

অজগর তার খাবার বস্তুকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তার হাড়-পাঁজড়া ভেঙে দেয়। তারপর তাকে ভক্ষণ করে। সংঘও ঠিক সেই কাজ করে। মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় প্রান্তিক/দলিত জাতিত্বের। ধীরে ভক্ষণ করা যায় তার পর।

১৯৪০-এর দশকে সংঘ প্রধান হন বেদানন্দ, যিনি এক মধ্যবর্ণের (আজও যাদের OBC বলা হয় সেই এক জাতির) পরিবার থেকে আসা। পূর্ব পদবী ছিল 'আশ'। কিছু বই পড়ে যতটা জেনেছি নিম্নবর্ণের আর কেউ সংঘের প্রধান হননি। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির থেকে তো নয়ই।

৪০-এর দশক বর্ণহিন্দু সমাজের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এক অভূতপূর্ব দশক। সেই দশকে নিম্নবর্ণের সংঘ প্রধান নিয়োগ এক বিরাট রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে হিন্দু সংগঠনের ক্ষেত্রে।

মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল (ইতিহাস এক প্রবীণ অধ্যাপক) তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন যে হিন্দু ছিলেন তাই মন্দির-এ আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি সংঘে যোগদান করবেন বলে মনস্থির করেন। তারপর কিছু বছর সংঘের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার পর তিনি দেখলেন, যতই কাজ করুক সংঘ কিন্তু বর্ণবাদের বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। সমস্ত ক্ষেত্রেই সেই বর্ণবাদের ভূমিকা রয়েছে।

মহেন্দ্রবাবু সেই সময় আম্বেদকরের রচনা পড়ছিলেন। সামনে এক রূঢ় সত্য-- সংঘের বর্ণবাদ।

আম্বেদকর পড়ে তিনি বুঝলেন প্রান্তিক জাতির পক্ষে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া

প্রান্তিক জাতি সমাজের প্রতি এক অবিচার ও অধর্ম করার মতোই কাজ। তাই তিনি আর বিশেষ যোগাযোগ রাখেননি সংঘের সাথে। মহেন্দ্রবাবুর বয়স এখন প্রায় ৬০ বছর।

অতএব দেখা যায় যে সূচনাপর্ব থেকে ৪০-এর দশক ধরে সাম্প্রতিক কালে ও বর্ণবাদও সংঘের সম্পর্ক নিবিড়, নিরবিচ্ছিন্ন। যখনই বর্ণহিন্দু সমাজের বিপদ আসে তখনই তাকে ক্ষতম করা সংঘ এবং সংঘের ন্যায় অন্যান্য সংগঠনের মূ ল 'কর্ম ও ধর্ম'।

প্রণবানন্দ ১৯২০ সাল নাগাদ আহ্বান জানান, বর্ণহিন্দুদের যাতে তারা অস্পৃশ্যতা বর্জন করে এই প্রান্তিক জাতির মানুষদেরকে ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবিষ্ট করে এবং একই সাথে বলেন, এই ভ্রাতৃত্ব তখনই সম্ভব যখন প্রান্তিক জাতিগুলি বর্ণহিন্দুদের আর শত্রু হিসেবে ধরবে না। যখন তারাও বর্ণহিন্দু বিদ্বেষ ত্যাগ করবে।

অর্থাৎ সুস্থ ও সুষ্ঠ সমাজ গঠনের দায় সেই প্রান্তিক জাতিদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন প্রণবানন্দ। সমস্ত দোষ, দায় সরিয়ে নিলেন বর্ণ হিন্দু সমাজের ওপর থেকে। মুসলমান বিরোধিতা ও বিদ্বেষ-এর বীজ পূর্বে প্রান্তিক/দলিত জাতির আন্দোলনকে খর্ব করতে বেশ খানিকটা সক্ষম হয়েছিল এবং এখনও সেই একইভাবে তারা চালিয়ে যাচ্ছে অজগরের কর্ম ও ধর্ম নিয়ে।

সমন্বয়ের প্রশ্নে ড. বি আর আম্বেদকর
চণ্ডালিনী

বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের অসংখ্য কর্মযজ্ঞ ও সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা করার অযোগ্যতা স্বীকার করে তার বিশ্লেষণে সমন্বয়ের কাহিনী তিনি কীভাবে বর্ণনা করেছেন সেদিকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হবে বর্ণিত প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

'এ পর্যন্ত আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি:

(১) ব্রাহ্মণরাই ইন্দো-আর্য সমাজব্যবস্থায় শূদ্রদের দ্বিতীয় বর্ণ থেকে চতুর্থ বর্ণে পতন ঘটায়।

(২) শূদ্রদের অবনমনের পদ্ধতি হিসাবে ব্রাহ্মণরা যে পদ্ধতি বেছে নেয় তা হল শূদ্রদের উপনয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা।

(৩) শূদ্র রাজাদের সময় ব্রাহ্মণদের ওপর শূদ্র রাজগণ যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতেন, সেই অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ নিতে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের এইভাবে সমাজে অবনমিত করে।

এইসব বিষয় যদিও খুব পরিষ্কার, তথাপি এমনও থাকতে পারে যারা এ ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন তুলতে পারেন যেমন;

(i) কয়েকজন মাত্র শূদ্র রাজার সঙ্গে বিরোধের জন্য কেন ব্রাহ্মণরা সমগ্র শূদ্র জাতির শত্রু হয়ে গেল?

(ii) শূদ্র রাজাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্রোধ কি এতই বেশি ছিল যার জন্য তারা প্রতিশোধপরায়ন হয়ে ওঠে?

(iii) এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে কি কোনো সমন্বয় হয়নি? যদি সমন্বয় হয়েই থাকে তাহলে শূদ্রদের পতিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের চেষ্টার কোনো প্রশ্ন ওঠে না কেন?

(iv) শূদ্ররা কীভাবে এই পতনের ফল ভোগ করে? (আ.র.স.-১৩, পৃ-২৫৩)

এইসব বিষয়কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ

ও ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, তার যুক্তি প্রতিস্থাপন নিম্নলিখিত তথ্য থেকে পাই।

'এখন প্রশ্ন হল কয়েকজন শূদ্র রাজার সঙ্গে বিরোধের জেরে কেন ব্রাহ্মণরা সমগ্র শূদ্র জাতির অবনমনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন? বিষয়টি শুধু প্রাসঙ্গিকই নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। দুটি বিষয় মনে রাখলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোনো সমস্যা নয়'। (আ.র.স.-১৩, পৃ-২৫৩)।

'রাজা সুদাস-এর প্রসঙ্গে বলতে হয়, বিরোধ ঘটেছিল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের শূদ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে। (আ.র.স.-১৩, পৃ-২৫৪)

'পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যেসব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে এই বংশ তালিকায় কিছুটা আলোকপাত করে। রাজা তিন্নি ছিলেন ইলা-এর পুত্র এবং বৈবস্বত ছিলেন মনু-এর পৌত্র এবং নহুষ হলেন পুরুরবা-এর পৌত্র। ইক্ষবাকু পুত্রদের অন্যতম ছিলেন নিমি আর ইক্ষবাকু ছিলেন বৈবস্বত মনু-এর পুত্র। ত্রিশঙ্কু ছিলেন ইক্ষবাকু-এর ২৮ তম অধস্তন পুরুষ এবং সুদাস ইক্ষবাকু-এর ৫০ তম অধস্তন পুরুষ। বৈবস্বত-এর অপর এক পুত্রের নাম বেণ। সবাই মনু-এর অধস্তন পুরুষ বলে দাবি করেন। অবশ্য কেউ কেউ ইক্ষবাকু-এর বংশধর বলেও দাবি করেন। মনু এবং ইক্ষবাকু-এর বংশধর হওয়ায় এটি সম্ভব যে তাঁরা সকলেই সুদাস-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এখন সুদাস যদি শূদ্র হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই যুক্তি প্রযোজ্য হয় যে ঐ সব রাজাই শূদ্র গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

আমাদের যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তথাপি একথা মনে করা অস্বাভাবিক হবে না যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এইসব বিরোধে শুধুমাত্র কয়েকজন শূদ্র রাজা নন, সমগ্র শূদ্র শ্রেণি জড়িয়ে পড়েছিল। একথা অবশ্যই মনে করতে হবে যে ঐসব বিরোধ সংঘটিত হয়েছে অত্যন্ত প্রাচীনকালে যখন কাজে ও চিন্তায় জীবনযাত্রা ছিল উপজাতি প্রকৃতির এবং তখনকার সমাজে এই ব্যবস্থা চালু ছিল যে কোনো গোষ্ঠীর একজন কোনো কাজ করলে সমগ্র গোষ্ঠীকে তার দায়ভার বহন করতে হবে। প্রাচীন সব সমাজেই ব্যক্তি নয়, জাতি বা গোষ্ঠীই ছিল সব এবং এর ফলে ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ সমষ্টি অপরাধ বলে গণ্য হত এবং গোষ্ঠীর কোনো অপরাধ ঐ গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেকেরই অপরাধ বলে গণ্য হত। এই সত্য যদি মনে রাখা হয় তাহলে একথা বলা খুবই স্বাভাবিক হবে যে অত্যাচারিত ব্রাহ্মণরা তাদের ক্রোধ ও হিংসা শুধুমাত্র অপরাধী রাজাদের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখেননি বরং সমগ্র শূদ্র জাতির ওপর তা ব্যাপ্ত করেন এবং শূদ্রের উপনয়ন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

করেন' (আ.র.স. পৃ-২৫৫)।

'এর পিছনে যথেষ্ট উস্কানি ছিল কিনা তা নিয়ে বিচার বিবেচনা করার কোনো অবকাশ নেই। উভয় পক্ষেই এ ব্যাপারে চরম উত্তেজনা ছিল। উভয় পক্ষেই এমন সব উত্তেজনা সামগ্রী ছিল যার মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে সমাজে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার যে দাবি করা হয়েছিল তা এতই সাংঘাতিক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল যে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবি জানানো হয়েছিল:

(১) ব্রাহ্মণদের শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই সকল বর্ণের গুরু হিসাবে মেনে নিতে হবে।

(২) অন্য বর্ণের লোক কী কাজ করবে, তাদের আচরণ কেমন হবে এবং কীভাবে তারা জীবিকা নির্বাহ করবে সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ব্রাহ্মণদের, অন্য বর্ণের লোক তা মানতে বাধ্য হত এবং রাজা ব্রাহ্মণদের দেওয়া বিধি অনুযায়ী রাজ্য শাসন করতেন।

(৩) ব্রাহ্মণরা রাজার কর্তৃত্বের বশীভূত ছিলেন না। রাজা ব্রাহ্মণ বাদ দিয়ে অন্য সব শ্রেণির উপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন।

(৪) ব্রাহ্মণরা বেত্রাঘাত, শৃঙ্খল পরানো, জরিমানা, নির্বাসন, ভর্ৎসনা এবং 'একঘরে' হওয়া থেকে মুক্ত ছিলেন।

(৫) শ্রোতৃয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কোনো প্রকার কর দিতে হত না।

(৬) কোনো ব্রাহ্মণ যদি কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পান তার মালিক হবেন তিনিই, আর রাজা যদি কোনো গুপ্তধন পান তার অর্ধেক মালিক হবেন ব্রাহ্মণ।

(৭) কোনো ব্রাহ্মণ যদি কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান তাহলে সেই সম্পত্তি রাজার অধিকারে যাবে না, তা ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে শ্রোতৃয় বা অন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে।

(৮) পথিমধ্যে শ্রোতৃয় বা অন্য কোনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হলে রাজা ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেবেন।

(৯) দেখা হলে রাজাকেই প্রথম ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করতে হবে।

(১০) ব্রাহ্মণদের দেহ পবিত্র। ব্রাহ্মণ যদি নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হন তাহলেও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না।

(১১) ব্রাহ্মণকে অপমান করা, তাঁকে আঘাত করা অথবা তার শরীরে রক্তপাত ঘটান অপরাধ বলে গণ্য হবে।

(১২) কিছু কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যান্য বর্ণের লোকের তুলনায় ব্রাহ্মণদের শাস্তির মাত্রা কম হবে।

(১৩) মোকদ্দমাকারী যদি ব্রাহ্মণ না হন তাহলে রাজা আর একজন ব্রাহ্মণকে সাক্ষী হিসাবে ডাকতে পারবেন না।

(১৪) এমন কোনো নারী যার দশজন স্বামী আছে এবং তারা সকলেই অব্রাহ্মণ এবং সেক্ষেত্রে ঐ নারীকে যদি কোনো ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন তাহলে সেই ব্রাহ্মণই তার স্বামী বলে গণ্য হবেন, কোনো অবস্থাতেই ঐ নারীর পূর্ব বিবাহিত রাজন্য বা বৈশ্যতার তার স্বামী বলে বিবেচিত হবেন না।

ব্রাহ্মণদের এইসব অন্যায় এবং অন্যায্য দাবি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কানে বলেছেন: 'ব্রাহ্মণদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে ছিল অন্য লোকের বাড়িতে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য অবাধ প্রবেশাধিকার। চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ থেকে অন্য লোকের বাসস্থান এবং এলাকা থেকে জ্বালানি, ফুল, জল এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা, পরস্ত্রীর সঙ্গে বিনা বাধায় কথাবার্তা বলা, বিনা পয়সায় নদী পারাপার এবং সবার আগে নদী পারাপারের সুযোগ প্রভৃতি। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যদি কোনো ব্রাহ্মণ পণ্য পারাপার করেন তাহলে তাকে কোনোরকম শুল্ক দিতে হবে না। কোনো ব্রাহ্মণ যদি ভ্রমণের সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ক্ষুধার্ত থাকেন তাহলে অন্যের ক্ষেত্র থেকে তিনি যদি দুখানা ইক্ষুদণ্ড অথবা অন্য কোনো ভক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করেন তাহলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না' (আ.র.স-১৩, পৃ-২৫৭)।

'এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার মধ্যে যখন তারা এক, দুই, তিন, আট এবং চৌদ্দ নম্বর সুযোগ তখন ভোগ করে চলেছেন তখন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোনো ভদ্রলোককে উত্তেজিত করার পক্ষে ঐগুলিই যথেষ্ট ছিল।

ক্ষত্রিয় রাজারা এই সবের কোনো কিছুতেই অপমান জ্ঞান করতেন না। কেমন করে তাঁরা তা করবেন? একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে সব ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে এসেছিলেন তাঁরা সব সূর্যবংশের রাজা ছিলেন। তাঁরা চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় রাজাদের চেয়ে বিদ্যায়, আভিজাত্যে এবং শৌর্যে আলাদা ছিলেন। যে সব ক্ষত্রিয় রাজা সূর্যবংশজাত ছিলেন তাঁরা ছিলেন তেজোদীপ্ত পক্ষান্তরে চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়দের তেমন কোনো শিক্ষা ছিল না। আর সূর্যবংশের ক্ষত্রিয় রাজাগণ বিদ্যায় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ ছিলেন তাই নয়, তারা অনেক সময় ব্রাহ্মণদেরও উর্দ্ধে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বেদের স্তোত্রও রচনা করেন এবং রাজর্ষি রূপে খ্যাত হন। যাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে গিয়েছিলেন

তাঁদের ক্ষেত্রেই এসব কথা প্রযোজ্য (আ.র.স-১৩, পৃ-২৫৯)।

মোট ৯১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেদের স্তোত্র রচনা করেন বলে ঘোষণা করা হয়। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণভুক্ত।

একথা যদি মনে রাখা হয় পুরুরবা-এর মাতা ইলা ছিলেন মনু-বিবস্বত-এর কন্যা, তাহলে দেখা যাবে তারাও সূর্যবংশের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ,আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত ছিলেন, সূর্যবংশের ক্ষত্রিয়দের সঙ্গ ব্রাহ্মণদের বিরোধ ঘটেছিল।

বেদের স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে শুধুমাত্র যে অনেক ক্ষত্রিয়ের নাম ছিল তাই নয়, এমন অনেক ক্ষত্রিয়ের নাম ছিল যাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। বেদের স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়রাই নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বেদের সবথেকে বিখ্যাত স্তোত্র গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিশ্বামিত্রের মত একজন বিখ্যাত সাধক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে উপায় ছিল না।

তাঁদের শৌর্য ও বিদ্যার অহঙ্কারে ব্রাহ্মণদের এই ভণ্ডামি ও অন্যায্য দাবি এতটাই আঘাত করেছিল যে যখন তাঁরা এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সেই চ্যালেঞ্জের প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই খুব কঠোর ছিল। তাঁরা ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেন। রাজা বেণ ব্রাহ্মণদের বাধ্য করেন, ঈশ্বর নয় শুধুমাত্র তাঁকেই পূজা করতে। রাজা পুরুরবা ব্রাহ্মণদের সম্পদ লুণ্ঠন করেন। রাজা নহুষ ব্রাহ্মণদের তাঁর রথের সঙ্গে জুড়ে দেশ এবং শহরের ভিতর দিয়ে সেই রথ নিয়ে যান। রাজা নিমি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তাঁর প্রাসাদের সবরকম ক্রিয়াকর্ম করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন এবং রাজা সুদাস ব্রাহ্মণদের ওপর এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর পারিবারিক পুরোহিত ঋষি বশিষ্ঠের পুত্রকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। এতে নিশ্চিতভাবেই ব্রাহ্মণরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাই নয়, তাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার এর থেকে বড় কারণ আর ছিল না এবং পরিণতিতে এইসব ঘটনা ব্রাহ্মণদের এতটাই উত্তেজিত করেছিল যে তারা শূদ্রদের ওপর এর প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠলেন'।

এসব বিষয় উত্থাপন করে বাবাসাহেব অসংখ্য যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সমাজে শূদ্রের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। মহাকাব্য ও পুরাণে কীভাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে সে তথ্যও দিয়েছেন। (১) ভরত বংশীয় বিশ্বামিত্র ও ত্রিৎসু বংশীয় বশিষ্টের কাহিনী উত্থাপন

করে। (২) ভৃগুমুনি ও ক্ষত্রিয় রাজা কৃতবীর্যের বিরোধের কাহিনী ও (৩) হৈহয় রাজা কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন ও পরশুরামের বিরোধ ও সমঝোতাকে কেন্দ্র করে মহাভারতের বন পর্বে এর বর্ণনা পাওয়া যায় বলে বলেছেন। এসবই মহাভারতের রচয়িতার সমঝোতা ও সমন্বয়ের কাহিনী। এর পরেও যা আছে তাতে 'একুশবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করার পর জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন'।

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যুদ্ধ সে সময়ে লেগেই থাকত। বশিষ্টের পুত্র শক্রি, শক্রির পুত্র পরাশর যখন শুনলেন তার পিতা শক্রিকে রাজা সুদাস আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন, তখন পরাশর প্রতিজ্ঞা করলেন সব জীবকে ধ্বংস করে দেবেন। এসব বলার অর্থ মহাকাব্যে যতই সমঝোতার ও সমন্বয়ের চেষ্টা করা হোক না কেন বাস্তবে কিন্তু ব্রাহ্মণরা শূদ্র বা ক্ষত্রিয় কাউকেই ক্ষমা করেনি। এ প্রসঙ্গে বাবাসাহেব যে তথ্য ও যুক্তি দিয়েছেন তা দেখা যাক--

'ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে যে কোনো প্রকার সমঝোতা হয়নি তার স্বপক্ষে সবথেকে বড় প্রমাণ হল ব্রাহ্মণদের শূদ্রদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন।

শূদ্রদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণরা যে কালাকানুন প্রণয়ন করে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের মধ্যে যে কোনো প্রকার সমঝোতা হয়েছিল তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের যে ক্ষমা করেনি তাই নয়, শূদ্রদের বংশধরদের প্রতিও তাদের প্রতিশোধস্পৃহা একটুও হ্রাস পায়নি। অনেকের এ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকা স্বাভাবিক এবং সেই কারণে চণ্ডাল এবং নিষাদদের সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মিশ্র বিবাহের ফলে চণ্ডাল ও নিষাদদের উৎপত্তি। নিষাদ হচ্ছে অনুলোম এবং চণ্ডাল হচ্ছে প্রতিলোম। অনুলোমরা উপনয়নের যোগ্য। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এখানে আইনের ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে এবং শূদ্র মাতার গর্ভে জন্ম নিষাদদের এবং নিষাদরা অনুলোম হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপনয়নের অধিকার দেওয়া হয়নি। কেন এক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল তা জানা দরকার। এর একমাত্র উত্তর হল ব্রাহ্মণরা শত্রুদের সন্তানদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন স্বরূপ এই ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ করে' (পৃ-২৬৯)।

সে কাল থেকেই সাহিত্যে যতই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-শূদ্র সমঝোতার চেষ্টা হয়ে থাকুক না কেন বাস্তবে তা হয়নি, এ বিষয়ে তার শেষ প্রতিবাদে বাবাসাহেব কী বলেন দেখা যাক—

‘আমাদের শেষ প্রতিবাদ হচ্ছে এই যে, এই ঘটনার পিছনে একটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। কারণটি হল এমন একটি মনোভাব কাজ করতে পারে যে ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্ররা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে তাতে ব্রাহ্মণরা বেশ ভীত হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের মনোভাবের ফলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা ভয় দানা বেঁধে উঠেছিল এবং তারা চিন্তা করেছিল যে শূদ্রদের এই আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করার নীরব উপায় হল তাদের উপনয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। হিন্দু সমাজে শূদ্ররা মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশে পরিণত হয়েছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য দেখেই ব্রাহ্মণদের মনে ভয় ও হিংসার উদ্রেক করেছিল মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্র এবং হিন্দু সমাজের শূদ্র বলতে কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম বোঝায় না।

হিন্দু সমজের শূদ্ররা জাতিগতভাবে ইন্দো-আর্য সমাজের শূদ্রদের বংশধর নয়। এই সন্দেহের কারণ ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্র এবং হিন্দু সমাজের শূদ্র সম্পূর্ণ আলাদা তা বোঝার ব্যর্থতা। ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্রের অর্থ কোনো এক ব্যক্তি বিশেষের নাম। কিন্তু হিন্দু সমাজে শূদ্র বলতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম বোঝায় না। এখানে শূদ্র বলতে বোঝায় অসংস্কৃতিসম্পন্ন এক শ্রেণির মানুষকে। এটি বিবিধ ও বিচিত্র উপজাতি ও গোষ্ঠীর একটি সাধারণ পদবি। একমাত্র নিচুমানের সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুতেই তাদের মধ্যে কোনো মিল নেই। শূদ্র নামে তাদের ডাকা ভুল। আর্য সমাজের একই নামধারী ব্যক্তি যারা ব্রাহ্মণদের অপমান করেছিল তাদের ব্যাপারে এদের কিছুই করার নেই। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই নির্দোষ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের পরবর্তীকালে আদি শূদ্রদের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয় এবং বিনা দোষে তাদের একই শাস্তি ভোগ করতে হয়। ইন্দো-আর্য সমাজের এবং হিন্দু সমাজের শূদ্ররা শুধু সম্পূর্ণ আলাদাই নয়, তাদের বৈশিষ্ট্যই আলাদা এবং তা যে সত্য একথা ধর্মসূত্রাকারদের মনে ছিল। এই পার্থক্য খুবই পরিষ্কার তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সৎ শূদ্রের এবং অসৎ শূদ্রের এবং অনির্বাসিত শূদ্রের ও নির্বাসিত শূদ্রের মধ্যে তাঁরা যে পার্থক্য করেছেন তার মধ্যে। সৎ শূদ্রের অর্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন শূদ্র এবং অসৎ শূদ্রের অর্থ অসংস্কৃতিসম্পন্ন শূদ্র। অনির্বাসিত শূদ্রের অর্থ যে শূদ্র গ্রাম সমাজের মধ্যে বাস করে, আর নির্বাসিত শূদ্রের অর্থ যে সব শূদ্র গ্রাম সমাজের বাইরে বাস করে। এটি সম্পূর্ণ ভুল এবং সে ভুল অনেকেই করে থাকেন যে এই বিভাজনের অর্থ আইন প্রণেতাদের কাছে শূদ্রদের অবস্থার উন্নতি হওয়া যে কিছু কিছু লোককে সমাজে মেলামেশার জন্য অনুমতি দেওয়া

হচ্ছে যা আগে কখনো হত না। সৎ শূদ্রের এবং নির্বাসিত শূদ্রের সঠিক ব্যাখ্যা হল আর্য সমাজের শূদ্রদের উল্লেখ এবং অসৎ শূদ্রের এবং অনির্বাসিত শূদ্রদের সম্পর্কে হিন্দু সমাজের শূদ্রদের উল্লেখ। আমরা আর্য সমাজের শূদ্রদের নিয়েই আলোচনা করছি। হিন্দু সমাজের শূদ্ররা যে একটি বড় জনগোষ্ঠী এই যুক্তির ভিত্তি হতে পারে না। আমরা একথা জানি না যে শূদ্ররা কি ছিল— উপজাতি, গোষ্ঠী অথবা কয়েকটি ভ্রাম্যমান পরিবারের সমষ্টি। কিন্তু তারা যদি একটি বড় উপজাতিও হয়, তাহলেও তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি হবে না। ভরত বংশীয়রা স্পষ্টভবে ঋগ্বেদে বলেছেন যে, তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন। পাঞ্চাল রাজ সত্রসাহ্ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তার উল্লেখ করে শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'সত্রসাহ্ যখন অশ্বমেধ যজ্ঞে আহুতি দেন তখন ছ'হাজার ছ'শ ত্রিশ জন তুর্বস বর্মাবৃত হয়ে হাজির হয়।

এতে যদি এই ইঙ্গিত করা হয় যে তুর্বস উপজাতির সংখ্যা ছ'হাজার হয়ে থাকে তাহলে শূদ্রদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। শূদ্রদের সংখ্যা নিয়ে এইসব প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া এই বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে তারা আর কী করতে পারত? যে ব্রাহ্মণদের তারা অপমান করেছে তারা তাদের উপনয়নের জন্য সেই ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হতে পারত। এই সব সম্ভাবনা অবশ্য বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, আমরা জানি না যে শূদ্রদের দ্বারা অপমানিত হবার পর তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্রাহ্মণরা একযোগে কোনো মোর্চা গঠন করেছিলেন কিনা এবং যদি করে থাকেন তাহলে সেই মোর্চা ছেড়ে কোনো ব্রাহ্মণের বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল কিনা। এছাড়া আমরা এও জানি না যে সেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সময় ব্রাহ্মণরা কেনো জাতি ছিল কিনা। কিন্তু একথা আমরা জানি যে ঋগ্বেদের সময় থেকেই ব্রাহ্মণরা একটি শ্রেণি হিসাবে পরিচিত ছিল। তখন থেকেই তাদের মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা গড়ে ওঠে এবং সেই শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় তারা তৎপর হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শূদ্রদের কোনো প্রকার প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত এমনও অসম্ভব ছিল না যে ঐ সময় উপনয়নের বিষয়টি পারিবারিক পুরোহিতদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। যে কথা বলা হল তা যদি সত্য হয় তবে সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণচক্রের বিরুদ্ধে শূদ্রদের বিশেষ কিছুই করার ছিল না (আ. র.স.-১৩, পৃ-২৩৭-২৮৪)।

সমস্ত বিবেচনা করে বাবাসাহেব শূদ্রদের অবনমন নিয়ে যে সম্ভাবনার কথা

বলেছেন তা নিম্নরূপ:

'আর একটি সম্ভাবনার বিষয় অবশ্য ছিল। সেটি হচ্ছে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটি সাধারণ মোর্চা গঠন করা যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের বিরোধিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায়। এটি সম্ভব ছিল কিনা তা কেবলই অনুমানের বিষয়। প্রথমত শূদ্ররা কি বুঝতে পেরেছিল উপনয়নের অধিকার হারালে ভবিষ্যতে তাদের সামাজিক মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমি নিশ্চিত যে, শূদ্ররা তা বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয়ত ক্ষত্রিয়রা কি তখন সংঘবদ্ধ ছিল? এ ব্যাপারে আমার সংশয় আছে। তৃতীয়ত অন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের কি শূদ্রদের ওপর কোনোপ্রকার সহানুভূতি ছিল? ঋগ্বেদে কথিত 'দশরাজন যুদ্ধ' কাহিনী যদি সত্য হয় তাহলে এটি সুস্পষ্ঠ যে শূদ্র এবং অন্যান্য অশূদ্র ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তেমন কোনো হৃদ্যতা ছিল না।

এই সমস্ত ঘটনা বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে এতে অবার হবার কিছুই থাকবে না যদি ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার হরণ করে থাকে এবং এটি ঘটনা'।

বাবাসাহেবের সমগ্র জীবনের যে আন্দোলন মন্দির প্রবেশ, উপবীত ধারণ, চৌদার পুকুর অভিযান, মৃত গোমাংস ভক্ষণ নিষেধ, পরিচ্ছন্ন থাকা ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা প্রভৃতি শুরু করেছিলেন শূদ্রের অবনমন ও তথা ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অনুশীলনের পর। সর্বত্র তিনি যুক্তিবাদের সাহায্যে বেদ পুরাণের তথ্যকে খণ্ডন ও বিশ্লেষণ করেছেন। অবশেষে তিনি তাঁর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করেছেন নিম্নরূপে:

(১) শূদ্ররা সূর্য বংশের আর্য সম্প্রদায়ের অন্যতম জাতি ছিল।

(২) ইন্দো-আর্য সমাজে শূদ্ররা ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত ছিল।

(৩) আর্য সমাজে কোনো এক সময় মাত্র তিনটি বর্ণ ছিল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শূদ্রদের আলাদা কোনো বর্ণ ছিল না, তারা ক্ষত্রিয় বর্ণের অংশভুক্ত ছিল।

(৪) শূদ্র রাজা ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিরন্তর বিরোধ লেগে থাকত এবং শূদ্র রাজাদের হাতে ব্রাহ্মণরা অনেক অত্যাচার ও অপমান সহ্য করেছে।

(৫) শূদ্র রাজাদের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের উপবীত ধারণের জন্য উপনয়ন পৌরহিত্য করতে অস্বীকার করে।

(৬) পবিত্র উপবীত না থাকায় শূদ্ররা সমাজে পতিত হল, তাদের স্থান হল বৈশ্যদের নীচে এবং এইভাবে তারা চতুর্থ বর্ণভুক্ত হল' (পৃ-২৭৫)।

পৈজাবনকে সুদাস বলে এবং ঋগ্বেদে পৈজাবনের সাথে সুদাসের সম্পর্কের

কথা বলা হয়েছে। বাবাসাহেব শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে উদাহরণ দিয়ে শূদ্রের অবস্থান নির্ণয় করেছেন, দেখা যাক সেখানে তিনি কী বলেন: 'শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যেখানে বলা হয়েছে বর্ণ মাত্র তিনটি এবং শূদ্র বলে আলাদা কোনো বর্ণ নেই। দ্বিতীয় বিষয় হল এমন প্রমাণ আছে যে শূদ্ররা রাজা ও মন্ত্রী ছিল। তৃতীয় যুক্তি হল শূদ্রদের একসময় উপনয়নের অধিকার ছিল। এসবগুলিই খুব জোরালো যোগসূদ্র এবং প্রথম যোগসূত্র যদি ব্যর্থ হয়ও তাহলে এগুলিই আমার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে পারে' (পৃ-২৭৮)।

বাবাসাহেব যুক্তির প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র সমস্যাকেই দেখাননি, সমস্যা ও তার সমাধানের সূত্রের ওপরও আলোকপাত করেছেন। এবার লক্ষ্য করব এবিষয়ে তিনি আর কী বলেছেন:

'আমার প্রবন্ধে যে বক্তব্য রয়েছে তাতে কতটা জোরালো যুক্তি রয়েছে তা আমি দেখিয়েছি। এখন আমি অবশ্যই প্রমাণ করব যে আমার এই যুক্তি অত্যন্ত খাঁটি। এর জন্য সাধারণভাবে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা খাঁটি বলে বিবেচিত আমি সেইভাবেই আমার প্রবন্ধের যথার্থতা প্রমাণ করব। প্রবন্ধের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত করতে হলে শুধুমাত্র সমস্যার সমাধান সুপারিশ করলেই চলবে না, এতে অবশ্যই দেখতে হবে যে, যে সমাধান সূত্র প্রস্তাব করা হচ্ছে তাতে সমস্যাকে ঘিরে যে রহস্য আছে তারও সমাধান হয়ে যায় (পৃ-২৭৮)।

'শূদ্রদের সম্পর্কে যেসব রহস্যপূর্ণ সমস্যা আছে তা দিয়েই শুরু করা যাক। এর মধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ:

(১) শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয় যে তারা অনার্য, তারা আর্যদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং আর্যরা শূদ্রদের পরাভূত করে ক্রীতদাসে পরিণত করে। তাই যদি হয়, তাহলে যজুর্বেদে এবং অথর্ববেদে ঋষিরা কিভাবে শূদ্রের জয়গান করেন এবং শূদ্রদের সুনজরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন?

(২) শূদ্রদের বেদপাঠের অধিকার নেই বলে বলা হয়ে থাকে। তাই যদি হয় তাহলে রাজা সুদাস যিনি একজন শূদ্র ছিলেন তিনি কী করে ঋগ্বেদের স্তোত্র রচনা করেন?

(৩) শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয় তাদের যজ্ঞ করার কোনো অধিকার নেই। একথা যদি সত্য হয় তাহলে কীভাবে শূদ্র রাজা সুদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন? কীভাবে শতপথ ব্রাহ্মণ শূদ্রকে যজ্ঞের হোতা বর্ণনা করেছে এবং তাকে সম্বোধন করার সূত্র নির্দেশ করেছে?

(৪) শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার নেই বলে বলা হয়ে থাকে। শুরু থেকেই শূ

দ্রদের উপনয়নের অধিকার ছিল না একথা যদি সত্য হয় তাহলে বিষয়টি নিয়ে এত বিরোধ কেন? কেন বদরী এবং সংস্কার গণতিতে বলা হয়েছে যে শূদ্রদের উপনয়নের অধিকার আছে?

(৫) শূদ্রদের ধনসম্পত্তির অধিকার নেই। তাহলে মৈত্রেয়নী এবং কথক সংহিতায় কেন বলা হয়েছে যে শূদ্রদের মধ্যে ধনসম্পদের অধিকারী লোক ছিল?

(৬) শূদ্রদের রাজকার্যের কোনো যোগ্যতা নেই বলে বলা হয়ে থাকে। একথা যদি সত্য হয়তাহলে মহাভারতে কেন শূদ্র মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে?

(৭) বলা হয়ে থাকে শূদ্রদের কাজই হল সেবা করা। অন্য তিন বর্ণের লোকদের ক্রীতদাসের মত সেবা করাই শূদ্রদের কাজ। তাই যদি হয় তাহলে শূদ্রদের মধ্যে রাজা ছিল কীভাবে? শূদ্র রাজা সুদাস এবং সায়নাচার্য বর্ণিত অন্যান্য রাজা কোথা থেকে এল?

(৮) শূদ্রদের যদি বেদপাঠে, উপনয়নে এবং যজ্ঞে কোনো অধিকার না থাকে তাহলে তাদের বেদপাঠ, উপনয়নে এবং যজ্ঞের অধিকার দেওয়া হয়নি কেন?

(৯) শূদ্রদের উপনয়ন, তাদের বেদশিক্ষা, যজ্ঞ প্রভৃতিতে শূদ্রদের নিজেদের কতটা লাভের ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রভূত লাভের বিষয়। কারণ ঐ কাজে পৌরোহিত্য করার ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। শূদ্রদের উপনয়ন, বেদ শিক্ষা প্রভৃতিতে অধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণরা ঐসব পৌরোহিত্য করে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আয় করার সুযোগ পেত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের বঞ্চিত করল কেন? বঞ্চিত না করলে তাদের কোনো ক্ষতি হত না এবং তাদের এক্ষেত্রে আর্থিক লাভের প্রচুর সুযোগ থাকত।

(১০) এমন কি শূদ্রদের উপনয়ন, বেদ শিক্ষা বা যজ্ঞের কোনো অধিকার যদি না থাকত, তাহলে এটি স্বীকার করা বা না করার অধিকার ব্রাহ্মণদের কাছে উন্মুক্ত থাকত। সুতরাং বিষয়গুলি ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া হল কেন? কোনো ব্রাহ্মণ যদি এসব কাজ করতেন তাহলে তার ওপর শাস্তি আরোপ করা হত কেন? (পৃ-১৭৮-২৮০)।

বাবাসাহেবের আজীবন সংঘর্ষের উদাহরণ দিলে তাঁর দৃষ্টিতে সমন্বয়ের কী চেষ্টা হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বেদ-পুরাণ পাঠ ও তার তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি সমাজে শূদ্রের অবস্থান নির্ণয় করেছেন। বর্তমানেও সেই শূদ্রের

অবস্থানের উন্নয়ন হয়নি তা আমরা বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে পাই। যেমন সাচার কমিটির রিপোর্ট থেকে মুসলমানদের অবস্থা জানতে পারি তেমনি মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট থেকে নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থান জানতে পারি। দেশকে উন্নত দেশ তখনই বলা যাবে যে দেশে আম্বেদকরকে অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করে উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষ, অধিক সংখ্যক মানুষ এবং পিছিয়ে রাখা মানুষেরা যখন উন্নতির শিখরে আসবে তখনই তা সম্ভব হবে। সুতরাং যারা আম্বেদকরকে শুধুমাত্র সংরক্ষণের জনক ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না তাদের সকলেরই আম্বদকর-এর আজীবনের সংগ্রাম ও পঠনপাঠন সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই সংগ্রামী পুরুষকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ আর এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারবে কিনা তা কালের বিচারের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সমীচিন।

তথ্য: আম্বেদকর রচনাসম্ভার - ১৩

সৌজন্য : নীড়

ড. ভীমরাও আম্বেদকর-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মেরুনা মুর্মু

ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ অধুনা মধ্যপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামজী মালোজী সকপাল ও মাতার নাম ছিল ভীমবাই। ছোটবেলা থেকেই মাহার জাতে জন্মগ্রহণের জন্য নানা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

সাতারা বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি দেখেন যে গরুর গাড়ির চালক তাদের গাড়িতে নিয়ে যেতে অস্বীকার করছে। বর্ণ হিন্দুরা তাদের কুয়ো থেকে জল খেতে দিচ্ছে না। স্কুলের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা বোর্ডের সামনে থেকে খাবার সরিয়ে নিলে তবে সে বোর্ডে গিয়ে অঙ্ক কষতে পারছে। বসার জন্য 'বস্তা' নিজেকে বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। অনেক বঞ্চনা স্বীকার করে ১৯০৭ সালে মাহার সম্প্রদায় থেকে তিনিই প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এলফিন্টন উচ্চবিদ্যালয় থেকে। ১৯১২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে স্নাতক হন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড়ের থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে ১৯১৩ সালে তিনি নিউ ইয়র্কের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করতে যান। কোলাপুরে ছত্রপতি শাহু মহারাজের সহায়তায় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি ডিগ্রি পান ও আইন অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন বোম্বাইয়ে ফেরেন তখন তিনি ওই প্রদেশের সেরা উচ্চশিক্ষিতদের একজন। দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার সুবাদে তাঁর যে কেবল আত্মবিশ্বাসই বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনারও উন্মেষ ঘটে। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষকে নিজস্ব ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে এবং সামাজিক অসাম্য দূর করতে হবে।

১৯২০ সালের মে মাসে নাগপুরে All India Conference of Depressed Communities-এ আম্বেদকর যোগদান করেন। তিনি স্পষ্টভাবেই জানান যে

একমাত্র অস্পৃশ্য নেতাই অস্পৃশ্যদের নেতৃত্ব দিতে পারে। এই সম্মেলনে তিনি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতের মানুষদের একসাথে খাওয়ার ব্যবস্থা করেন যাতে ক্রমোচ্চ বর্ণবিভেদের অবসান ঘটানো যায়। ১৯২৪ সালের মে মাসে তিনি সোলাপুরে সোলাপুর Depressed Class-এর প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির বক্তৃতায় জানান যে অস্পৃশ্যতা দাসত্বের চেয়েও কঠোর এবং অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার জন্য ধর্মত্যাগ একটি পন্থা।১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ে তফসিলী জাতিদের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে স্পষ্ট জানান যে মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও খাদি ব্যবহারের প্রতি বেশি আগ্রহী। তবে ১৯২৭ সালের প্রথম মাহার সম্মেলনে সত্যাগ্রহের পথ বেছে নেন। তিনি মাহারদের অস্পৃশ্যতাজনিত মানসিক অবসাদ থেকে উজ্জীবিত করতে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রতি সচেষ্ট হন। আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাদের গলিত মাংস খাওয়া, সুরা পান, উচ্ছিষ্ট খাওয়া, ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। এখানে উচ্চবর্ণের ব্যবহৃত চৌদার জলাধার থেকে মাহাররা জলপানেও সক্ষম হলেন, মাহারদের উপর নেমে আসে সবর্ণের নির্মম আক্রমণ। এই সম্মেলনকে '**দলিত বিপ্লব**' বলে চিহ্নিত করা হয় কারণ দলিতদের জন্য এ এক নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক দিগন্ত খুলে দেয়। আম্বেদকর "The Depressed India" লেখায় বিস্তৃতভাবে লেখেন যে প্রক্রিয়া মানুষকে একত্রিত করে তাদের অধীনতার থেকে মুক্তি দান করে দেশকে সমৃদ্ধ করে সেই কার্যকলাপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকাই সত্যাগ্রহ। মাহারের দ্বিতীয় সম্মেলনে তিনি বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মনুস্মৃতি পোড়ান কারণ তা অস্পৃশ্যতাকে ও সামাজিক অসাম্যকে স্বীকৃতি দেয়। ২৫ ডিসেম্বরকে আজও মনুস্মৃতি দহন দিবস বলে স্মরণ করা হয়। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিচক্ষণতা দেখিয়ে ঘোষণা করেন যে মাহারের জলাশয় থেকে জলপানের অধিকার ফিরে পেতে তিনি আইনি পথেই এগোতে চান।

মাহার সম্মেলন যদি আম্বেদকরকে মাহারদের পথপ্রদর্শক হিসাবে চিহ্নিত করে, ১৯৩০-৩২ গোল টেবিল বৈঠকে অন্ত্যজদের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর মনোনয়ন তাঁকে তাদের অধিনায়ক হিসাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই ঘোষণা করেছিলেন যে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করার পন্থা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা। তিনি এও বলেন যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ অসম্ভব তাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

আবশ্যক। কারণ যদি দেশ স্বাধীন হয় তাহলে দলিতরাও নিজেদের মুক্ত করতে পারবে। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে তিনি দলিতদের জন্য পৃথক মনোনয়ন (Seperate Electorate) দাবি করেন যখন অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা স্ব-স্ব মনোনয়ন কেন্দ্র দাবি করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে পুনরায় মনোনীত হওয়ার পর গান্ধিজী আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করতে চান। আম্বেদকর গান্ধিজীকে জানিয়ে দেন কোনো দলিত যার মানবিক বোধ ও আত্মসম্মান আছে সে ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি মনে করতে পারে না যেখানে তার জীবনের মান বেড়াল ও কুকুরের থেকে খারাপ ও যেখানে যে সহানুভূতি জন্তুজানোয়ারের প্রতি দেখানো হয় সেটুকু থেকেও সে বঞ্চিত। লণ্ডনের বৈঠকে গান্ধিজীর সঙ্গে আম্বেদকরের দলিতদের সংখ্যালঘু কিনা এই মতানৈক্যের জের সঙ্গীন আকার ধারণ করে যখন ১৯৩২-এর আগস্টে Macowalds Communal Award দ্বারা মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও দলিতদের পৃথক মনোনয়নের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরণ অনশন ঘোষণা করেন। গান্ধিজীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে মদন মোহন মালব্য ও দলিতদের পক্ষ থেকে আম্বেদকর পুণা চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন যার দ্বারা দলিতদের জন্য (Reserve Seats) সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করা হয় সব প্রাদেশিক আইনসভায়।

পুণা চুক্তি দ্বারা গান্ধিজী ও আম্বেদকরের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও পদ্ধতিগত প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। গান্ধিজী বিশ্বাস করেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের একমাত্র পন্থা হল সবর্ণ হিন্দুদের দলিতদের প্রতি হৃদয়ের পরিবর্তন। পুণা চুক্তির পর তিনি দলিতদের হরিজন নামে অভিহিত করেন এবং মনে করেন উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহারের জন্য। অন্যদিকে আম্বেদকর মনে করতেন দলিতদের মুক্তির পথ হল তাদের অসন্তোষের আইনি সমাধান, তাদের অধিকারের স্বীকৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। যদিও পুণা চুক্তি দ্বারা দলিতদের সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক যোগদান নিশ্চিত হয়েছেল। আম্বেদকর পুণা চুক্তিকে গান্ধিজীর সঙ্গে মতবিরোধের প্রারম্ভ বলেই মনে রেখেছিলেন।

১৯৩৫ অক্টোবর মাসে নাসিকের Scheduled Caste Federation-এর অধিবেশনে আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে দলিতদের হিন্দু সমাজে বসবাসই তাদের অবদমন ও বঞ্চনার কারণ তাই তিনি হিন্দু হয়ে জন্মালেও তিনি হিন্দু হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নারাজ। এই অধিবেশনে একটি resolution পাশ করা হয় যাতে বলা হয় যে সামাজিক ও ধর্মীয় সাম্যের প্রয়োজনে দলিতদের গণ ধর্মান্তরকরণ

আবশ্যক। ১৯৩৬ সালে তিনি **Independent Labour Party** প্রতিষ্ঠা করেন যেটি ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বোম্বাই আইনসভায় তফসিলী জাতিদের জন্য সংরক্ষিত ১৫টি আসনের মধ্যে ১০টি জেতে এবং সাধারণ আসনের ৩টি জেতে। এই পার্টির দ্বারা আম্বেদকরের সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ পায়। ১৯৩৬ সালেই তিনি একটি পুস্তিকা *Annililation of Caste* প্রকাশ করেন যেখানে তিনি বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্যকে বিলোপ করার দাবি তোলেন যাতে হিন্দু ধর্ম শুধুমাত্র নিয়মানুবর্তিতায় ঢাকা না পড়ে যায়। হয়ত তিনি একটা রূঢ় ধাক্কা দিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের বৈষম্যমূলক ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। আম্বেদকর নতুন ধর্ম হিসাবে শিখ ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বিষয়ে আগ্রহী হন তবে ধর্মান্তরকরণ নিয়ে শেষ বিবেচনা ভবিষ্যতের জন্যই তুলে রাখেন।

তিনি রাজনৈতিকভাবে নিজের মতাদর্শ সুসংহত করায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪২ সালে আম্বেদকর ভাইসরয়ের কাউন্সিলে শ্রমমন্ত্রীর পদে অনুমোদিত হন। আম্বেদকর জানান যে তিনি তার পদ ব্যবহার করে দলিতদের সমানাধিকার দানের প্রচেষ্টা করবেন। পনেরো মাস মন্ত্রীত্বের সময় তিনি সিভিল সার্ভিসে দলিতদের নেওয়া, দলিতদের জনসংখ্যা অনুপাতে চাকরি প্রদান, তাদের পঠনপাঠন খ াতে টাকা প্রভৃতি দাবি রাখেন। ১৯৪৫ সালে তিনি একটি বই লেখেন: *What Congress and Gandhi have done to the untouchable* যেখানে তিনি পুনরোক্তি করেন দলিতরা হিন্দুদের থেকে পৃথক সম্প্রদায় ও তাদের জন্য পৃথক গ্রাম থাকা প্রয়োজন। ১৯৪৬ সালে আবারও পুণা, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুরে তিনি সত্যাগ্রহ চালু করেন পৃথক মনোনয়নের জন্য। Cripps Mission-এর সামনেও আম্বেদকর এই দাবি পেশ করেন যা খারিজ করে দেওয়া হয়। তিনি প্রচার মাধ্যমের সামনে বিবৃতি দেন যে ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তখন কংগ্রেসের উচিৎ দেশের ছয় কোটি দলিত যাতে ভারতের সংবিধানে নায্য অধিকার পায় তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন ন্যায্য অধিকারের দাবিতে ভারতবর্ষের দলিতরা একত্রিত হয়ে অহিংস পন্থায় আন্দোলন চালাবে। আম্বেদকর সংবিধান নির্মাণের খসড়া কমিটিতে মনোনীত হন এবং আইনমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় তিনি নির্বাচিত হন ও সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৪৮-এর নভেম্বর মাসে অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি কেন্দ্রিক বিধান ঘোষণা করা হয়। সংখ্যালঘুদের বিষয় সরকারি কর্মচারি, আইনসভায় ও

সরকারি চাকরিতে দলিতদের প্রতিনিধি, দলিতদের পঠনপাঠনের বিষয় বিশেষ সরকারি মনোযোগের বিষয়েও বিধান পাশ করা হয়। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে সংবিধান গ্রহণের সময় তিনি সতর্ক করে দেন যে যদিও রাজনৈতিক সমতা আনা সম্ভব হয়েছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য যদি অদূরেই নির্মূল করার চেষ্টা না করা হয় তাহলে রাজনৈতিক কাঠামো বিনষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আম্বেদকর Republican Party of India প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একই সময়ে তিনি ঘোষণা করেন যে ১৪ অক্টোবর দশমীর দিন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবেন। ১৬ অক্টোবর প্রায় এক লাখ দলিতও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। আম্বেদকর বলেন যে বৌদ্ধধর্মের যৌক্তিকতা, সাম্যবাদ ও মর্মবেদনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তিনি ধর্মান্তরকরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ তে আম্বেদকর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এক যুগের সমাপ্তি ঘটে। New York Times তাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে লেখে যে যদিও সারা বিশ্ব আম্বেদকরকে অস্পৃশ্যদের অধিনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করে, শুধুমাত্র কতিপয় মানুষই অনুধাবণ করেছিলেন যে তিনি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক পরিকাঠামোয় নিজের প্রভাব রেখে গেছেন।

আম্বেদকর-এর মা, মাটি ও মানুষ

স্মৃতিকণা হাওলাদার

অলীক আত্মা, পুনর্জন্মবাদ ও ব্রহ্মবাদ পাঞ্চালরাজ প্রবাহনই সর্ব্বপ্রথম চালু করেন। যাতে করে আর্যদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে অনার্যদের শ্রমের ফল বিনা পরিশ্রমে ভোগ করতে পারে এবং প্রজারা রাজার বিরোধিতা না করতে পারে। প্রবাহনের স্ত্রী লোপামুদ্রা এই চালাকি ধরতে পেরে প্রবাহনকে বলেছিল— 'তুমি কী চাও? প্রজাদের ভ্রমাচ্ছন্ন করে রাখতে তুমি অতি নিষ্ঠুর প্রবাহন, নিজের স্বার্থের জন্য মানুষকে চির সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ'। লোপার ভাইঝি গার্গীও যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপ বিরোধিতা করেছিল বলে তার মাথা কেটে নেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছিল এবং যাজ্ঞবল্ক্য সেইরূপ ব্যবস্থাও করে রেখেছিল।

হয়তো বা সেদিন থেকেই পুরুষের মনে নারী বিদ্বেষ তৈরি হতে থাকে, তৈরি হতে থাকে নারীদের দমিয়ে রাখার গোপন ষড়যন্ত্র। তাই তো শাস্ত্রে একদম পাকাপাকিভাবেই ঠাঁই দেওয়ার জন্য পাপযোনী নরকের দ্বার বেয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হাজির। অনার্যদের যত ক্ষত করা যায় সেই বাণী প্রচারে।

আর্যরা আসার আগে এই দেশে কোনো বর্ণভেদ ছিল না। তার ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আর্যদের ঋকবেদেই বর্ণভেদের বীজ রোপন করা হয়। নারীদের কোনো বর্ণ নেই, তারা সকলেই শূদ্রানী। সূর্যের মুখ দেখাও যেন পাপ। আতুর ঘরই তাদের একমাত্র উপযুক্ত জায়গা অবশ্যই পুত্রসন্তান প্রসবের যন্ত্র আর তা না হলেই অশেষ দুর্গতি। ঘরের সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাদেরই। তাই-ই তারা করতে বাধ্য।

শুঙ্গ যুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত বর্ণভেদকে জাতভেদকে বংশানুক্রমিক করা হয়। আর বিষয়গুলিই গীতার পরিবেশন করা হয়েছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার একমাত্র ধর্ম। তুমি যুদ্ধ না করলে অনার্যরা পদসেবা করবে না, নারীরাও তদ্রূপ। সুতরাং যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। শুরু হল জাতিভিত্তিক কাজের ব্যবস্থা।

উচ্চবর্ণ আর্যদের নির্মম অত্যাচার বহুযুগ সহ্য করেছে ভারতীয় দলিত মানুষ। তারা মিথ্যে শাস্ত্রের কারাগার ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সময় চলে গেছে। এখনও যাচ্ছে, তবুও বেরিয়েছে। সবথেকে বিশ্বের বড় মঙ্গলময় কাজ করেছে জ্যোতিরাও ফুলের অনুসরণকারি ভাবশিষ্য, শাহু মহারাজের বন্ধু বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। তিনি ভারতের মূল শোষণ যন্ত্রের উপর আঘাত হেনেছেন, সেটা হল ব্রাহ্মণ্যবাদ যা নিহিত আছে গীতা ও মনুসংহিতায়। বাবাসাহেব মনুসংহিতা নিজে পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং বুদ্ধের বাণী গ্রহণ করেছেন যা কিনা আদি ভারতের সংস্কৃতি।

বাবাসাহেবের অনেক কীর্তির মধ্যে তার বড় কীর্তি তিনি যখন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মা-মাটি-মানুষকে কী করে সম্মান দিতে হয়। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটির বিল ঘোষণা করেন যারা কিনা শ্রমিক কারখানার মহিলা শ্রমিক তাদের সুবিধার জন্য। এই বিলটি পাশ হয় ১৯২৯ সালে। এই বিলটি পাশ হয় বোম্বাইতে, তারপর মাদ্রাজে এই বিলটি পাশ হয় ১৯৩২-এ। অন্য দেশে কয়লাখনির শ্রমিকরাও ৮ সপ্তাহের ছুটি পায় ১৯৪২ এবং ১৯৪৬-এর মধ্যে সে আইনও পাশ করেন। তখন তিনি লেবার মিনিস্টার। তারপর ধীরে ধীরে ১৯৬১ সালে ভারতের সমগ্র রাজ্যেই মাতৃত্বকালীন ৮ সপ্তাহ ছুটির বিলটি পাশ হয়। বাচ্চা প্রসবের আগে ৪ সপ্তাহ এবং পরে ৪ সপ্তাহ। ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোট দিবস মানা হয়। সেদিন নারী-পুরুষ সকলে ভোটের অধিকার পায়।

বাবাসাহেব অনেক আইন প্রণয়ন করেন মহিলাদের জন্য—

১। কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য সুবিধা।

২। মহিলা লেবার ওয়েলফেয়ার।

৩। মহিলা এবং শিশুরক্ষা ওয়েলফেয়ার।

৪। প্রসবকালীন ছুটি বেতন সহযোগে।

৫। মহিলাদের মাটির নিচে কোনো খনিতে কাজ করতে দেওয়া যাবে না।

১১ এপ্রিল ১৯৪৭ বাবাসাহেব প্রথম মহিলাদের স্বামী এবং তার পিতার সম্পত্তির অধিকারের জন্য বিল পেশ করেন। হিন্দু কোড বিলের মাধ্যমে নেহেরু বিরোধিতা করলেও নিজ স্বার্থে অর্থাৎ ইন্দিরার স্বার্থে মেনে নেন।

আর্যরা যখন এদেশে আসে তারা চাষ জানত না। অনার্যদের দেখে শেখে। ইন্দ্র দেখলেন- বাঃ, সুন্দর ব্যবস্থা। রাজা সকল ঝরনা বা নদী আটকে জমিতে জলের ব্যবস্থা করছে। কোনো কোনো রাজা খাজনা না দিলে তার জমিতে জল দিতনা।

ইন্দ্র সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন। গোপনে বাঁধ ভেঙে তাদের জমিতে জল দিয়ে নিজের দলে লোক সংগ্রহ করতেন। আর যারা তার কথা শুনত না,বাঁধ ভেঙে তাদের ভাসিয়ে দিতেন। সেই সব জমি ফেলে কত লোক পালিয়ে গেছে, কত লোক মারা গেছে তার কোনো হিসাব নেই।

সেই সব হিসাব নিতে এসেছেন এতদিন পরে ভারতবর্ষে ত্রাণকর্তা স্বয়ং বাবাসাহেব। বাবাসাহেব ভাবলেন খরা, বন্যা, চাষ এবং বিদ্যুৎ-এর জন্য চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

বাবাসাহেব বাংলা, বিহার সরকারের সঙ্গে এক আলোচনায় বসলেন ৩ জানুয়ারি ১৯৪৪। দামোদরকে বাঁধ দিয়ে কী করে আটকানো যায় বন্যা এবং সেই সঙ্গে চাষাবাদের সুবিধা এবং প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ তৈরি করার সুবন্দোবস্ত।

সুতরাং বাবাসাহেব ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করে নিজের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৪ সালে গঠন করলেন দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্ট। ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫। ৫৫ কোটি টাকা খরচের অনুমোদন নিয়ে প্রথম বাঁধ তৈরি শুরু করেন তার নাম তিলাইয়া ড্যাম, কোডারমা এবং মাইথনের উপরে।

তারপর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল দামোদর ভ্যালি। তখন ১৯৪৬ সাল। ভারতের সব থেকে বড় ড্যাম হীরাকুঁদ বাঁধ। এইসব বাঁধের পরিকল্পনা এবং কাজ শুরু করে বলেছিলেন, আমরা সঠিকভাবে কাজ করলে ভারত বন্যার হাত থেকে রেহাই পাবে এবং প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। চাষের কথা বলতে তিনি বলেছেন কোনো কোনো জায়গায় বন্যার পলি জমা হয়ে প্রচুর জমি পড়ে রয়েছে যেখানে চাষ হয় না এবং সেগুলো খুব উন্নত ধরনের মাটি সেই আর্য আগমনের সময় থেকে এবং এও তিনি বলেছেন ভারতবর্ষে যে চাষের জমি আছে তার চারভাগের এক ভাগ মাত্র চাষ হয় আর সব বিনা চাষে পড়ে রয়েছে। যার পাঁচশো ছয়শো বিঘা জমি রয়েছে, সেদিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ঐ পড়ে থাকা জমি চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দিলে এবং বাঁধের জলের সঠিক ব্যবস্থা করে দিলে ভারতবর্ষে কোনো লোক অনাহারে মরবে না বরং এদেশ থেকে চাল, গম অন্যদেশে রপ্তানি করা যাবে এবং দরকারে সাহায্যও করা যেতে পারে। মিথ্যে এই গরীবি হঠাও বলে কোনো লাভ নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের মা, মাটি মানুষকে সত্যিকারের ভালবেসিছিলেন এবং তার যোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর।

ভারতীয় মার্ক্সবাদ প্রসঙ্গে আম্বেদকর

এস কে লিম্বালে

বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবন ও কর্ম সমাহারে বহিষ্কৃত মানুষের মুক্তির জন্য নিবেদিত। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজ, আইন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আম্বেদকর তাঁর নিজস্ব চিন্তন ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর অজস্র লেখ ালেখিতে। তিনি অস্পৃশ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের স্বাধীনতার কথা বারবার বলেছেন। মার্ক্সবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময়েও তিনি এই সমস্ত প্রসঙ্গ মাথায় রেখেছেন। তিনি যখন দেখলেন মার্ক্সবাদী দর্শনের বৃত্তে জাতিভেদপ্রথা অবসানের প্রসঙ্গ কোনোভাবেই আলোচিত হয়নি, তখন তিনি মার্ক্সবাদকে ভারতীয় সমাজে জাতিভেদপ্রথা অবসানের ক্ষেত্রে একটি অসম্পূর্ণ দর্শন বলেই বিবেচনা করেন। অস্পৃশ্যতার অবসান তাঁর কাছে প্রধানত সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচিত হয়েছিল। সেইজন্য তিনি বলেন, ''লেনিনের জন্ম যদি ভারতে হতো তাহলে তিনি সর্বপ্রথমে জাতিভেদ প্রথারই অবসান করতেন; এবং এই লড়াইকে বাদ দিয়ে তিনি বিপ্লবের কথা ভাবতেন না''। অথবা তিলক যদি কোনো অস্পৃশ্য জাতে জন্ম নিতেন তাহলে তিনি 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' বলে চিৎকার করার আগে নিশ্চিতভাবেই বলতেন, ''অস্পৃশ্যতার বিলোপ আমার প্রাথমিক কর্তব্য''। লেনিন ও তিলক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিপ্লব বা স্বরাজ নয়, জাত ব্যবস্থার বিলোপই ছিল তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। ভারতে বিপ্লব বা স্বরাজের দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক সমস্যা এবং এই অস্পৃশ্যতার বিলোপ সম্ভব কেবলমাত্র সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। তাঁর মতে, ভারতে রাজনৈতিক বিপ্লব অপেক্ষা সামাজিক বিপ্লব বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় হিন্দু সমাজ বিভিন্ন জাতি-উপজাতি ইত্যাদিতে বিভক্ত। এই

জাত ব্যবস্থা কেবলমাত্র সমাজের বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়নি। সমাজে উচ্চ-নীচের যে ধারণা রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেও তৈরি হয়েছে। জাতিভেদ প্রথায় একটি জাত অন্য জাতকে তার থেকে হীন প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক জাতই যেন অন্য জাতকে সন্দেহের চোখে দেখে। যদি এই জাত বিভাজন লুপ্ত হয়, তাহলে অনেকেই অন্যদের থেকে যে বিশেষভাবে সুযোগ সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে, তারা তা হারাবে। বাবাসাহেব বলেন, ''জাত বিভাজন কেবলমাত্র শ্রমবিভাজন নয়, তা শ্রমিকের বিভাজনও বটে''।

এই বিভাজন ধর্মীয় রাজনীতি ও উচ্চনীচ ধারণা থেকে উপজাত। এইজন্য শোষিত উচ্চবর্ণ ও শোষিত দলিতের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার একটা পার্থক্য সবসময়েই থেকে যায়। একজন ব্রাহ্মণ শ্রমিক ও একজন দলিত শ্রমিকের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বাবাসাহেব কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেছেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে। কমিউনিস্টরা কখনও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি বলেই তিনি মনে করতেন। তিনি বলে--- ''আমি শুনেছি শ্রমিক নেতা চমৎকার বক্তৃতা করছেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও কোনো নেতাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বলতে শুনিনি''। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্যবাদ শোষণ পদ্ধতিতে ততটাই ষড়যন্ত্রী যতটা পুঁজিবাদ স্বয়ং। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার অসাম্য দলিতকে শোষণ করেছে ও দাসে পরিণত করেছে। দলিতের ওপর অন্যায় ও অত্যাচার চলেছে ক্রমান্বয়ে। বাবাসাহেব অসাম্যের বিরুদ্ধে অবদমিতের লড়াইকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শ্রমিক নেতাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন, কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত শোষণচক্রের বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ করেননি। কিন্তু কমিউনিস্টরা কেন এই সমস্যার দিকে আলোকপাত করলেন না; এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি বলেন, ''যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের মত কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে বলতে যায় তাহলে তারা আজ শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একজন সমর্থকও খুঁজে পাবে না''।

২০ নভেম্বর, ১৯৫৬ তে কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব্ বুদ্ধিস্ট-এর চতুর্থ সম্মেলনে এবং তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ''বুদ্ধা আউর কার্ল মার্ক্স''-এ বাবাসাহেব আম্বেদকর বুদ্ধ ও মার্ক্সের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বুদ্ধের দর্শনকেই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, কারণ মার্ক্সবাদ হিংসা ও একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়। তাঁর মতে বুদ্ধের দুঃখের ধারণা ও মার্ক্সের শোষণের ধারণার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। বুদ্ধ যেখু

ানে অহিংসার বাণী প্রচার করেন, সেখানে মার্ক্স প্রয়োজন অনুসারে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হিংসার পথ অবলম্বন করার কথা বলেন। বাবাসাহেবের মতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ কমিউনিজনের একটি মডেল। শুধু সেখানে একনায়কতন্ত্র নেই। বাবাসাহেব মনে করতেন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, অধ্যাত্মবোধও প্রয়োজন।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুর পরে মার্ক্সবাদ বনাম আম্বেদকরবাদ বিতর্ক ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়। ১৯৫৭ সালের ৩ অক্টোবর আম্বেদকর অনুগামীরা আম্বেদকরের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেন। দলের নেতাদের মধ্যে মার্ক্সবাদ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলতে থাকে। দাদাসাহেব গায়কোয়াড় বলেন যে, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া ছিল সমস্ত অবদমিত শোষিত ও সর্বহারা মানুষের পার্টি। বি.সি. কাম্বলে গায়কোয়াড়কে মার্ক্সবাদী বলে আক্রমণ করেন। নানা মতবিরোধ ও বিতর্কের কারণে ক্রমে ক্রমে পার্টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

৯ জুলাই, ১৯৭২, রিপাবলিকান পার্টির রাজনৈতিক ব্যর্থতার পৃষ্ঠভূমিতে দলিত যুবকদের একটি নতুন সংগঠন তৈরি হয়, যা দলিত প্যান্থার নামে খ্যাত। দলিত প্যান্থারের যুবক নেতাদের মধ্যেও মার্ক্সবাদ একটি বিতর্কের বিষয় ছিল। নামদেও ধসাল দলিত প্যান্থারের যে ম্যানিফেস্টো তৈরি করেন, রাজা ঢালে তা মার্ক্সবাদী ম্যানিফেস্টো হিসাবে বিবিচনা করেন ও তীব্র সমালোচনা করেন। নামদেও ধসাল তাঁর এই ম্যানিফেস্টোতে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছিলেন। তিনি দলিতের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বহারা, শোষিত, পীড়িত ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন, যা রাজা ঢালের পছন্দ ছিল না। ঢালে ধসালকে কমিউনিস্ট বলে অভিযুক্ত করেন এবং দলিত প্যান্থার থেকে ইস্তফা দিয়ে 'মাস মুভমেন্ট' নামক একটি নতুন সংগঠন তৈরি করেন। এর ফলে দলিত প্যান্থার বিভাজিত হয়ে যায়।

দলিত আন্দোলনের নেতা ও অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে মার্ক্সবাদ যেভাবে বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইভাবে দলিত সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যেও মার্ক্সবাদ বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে এবং তা বহু চর্চিত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য সম্মেলন, দলিত সাহিত্য সম্মেলন, আর অস্মিতাদর্শ মেলা, এ সবই দলিতদের মধ্যে দল বিভাজনের নিদর্শন।

অনেক দলিত লেখক ও সমালোচক মার্ক্সবাদের সমালোচনা করেছেন। যেখ

ানে বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদী আদর্শ কেবল আর্থিক বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সেখানে আম্বেদকরবাদের আদর্শ সামাজিক বৈষম্যের ছুঁৎমার্গীতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মার্ক্সবাদ সামাজিক বৈষম্যের সমালোচনা করে না, তাই দলিত লেখকরা মনে করেন মার্ক্সবাদ একটি অসম্পূর্ণ মতবাদ।

দলিত সমালোচকরা মার্ক্সবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মার্ক্সবাদ সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না কিন্তু আম্বেদকরবাদ সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। এর মাধ্যমে যে কথা তাঁরা বলে ফেললেন তা হল, আম্বেদকরবাদ অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিৎ ছিল যে, মার্ক্সবাদ বা আম্বেদকরবাদ এতোটা একমাত্রিক কোনো দর্শন নয় যে তা কেবলমাত্র আর্থিক বা সামাজিক বলে দেগে দেওয়া যায়। একথা বললেও চলবে না যে, দলিতের সমস্যা কেবলমাত্র সামাজিক, তা অর্থনৈতিক নয়। সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দলিতকে একইভাবে শোষণ করে। দলিতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই দুইস্তরেই লড়াই করতে হবে। দলিত সাহিত্য দলিতের লড়াই-এর সাহিত্য। এখন দলিত সাহিত্য আন্দোলনকে আম্বেদকরবাদের সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সবাদকেও স্বীকার করতে হবে এবং তবেই এ লড়াই অর্থপূর্ণ হবে। আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হব সম্মিলিতভাবে।

মার্ক্সবাদ থেকে আম্বেদকরবাদকে দূরে সরিয়ে রেখে কিংবা আম্বেদকরবাদের তুলনায় মার্ক্সবাদকে একটু ছোটো করে দেখিয়ে দলিত সমস্যার সহজ সমীকরণ যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা করছেন তাঁরা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনাই করছেন। যদি এই সমন্বয় সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁদের হাতে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত সামাজিক বা সাহিত্যিক প্রতারণা হতেই থাকবে।

আম্বেদকরবাদের কেন্দ্রবিন্দু সাধারণ মানুষ। মার্ক্সবাদের কেন্দ্রবিন্দু শোষিত পীড়িত মানুষ। বৌদ্ধ দর্শনও শোষিত মানুষের কথা বলে। গৌতম বুদ্ধ, কার্ল মার্ক্স আর বাবাসাহেব আম্বেদকরের তত্ত্বজ্ঞানের সারকথা হল শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি। বুদ্ধদেব, মার্ক্স ও আম্বেদকরের চিন্তনের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই কারণেই মার্ক্স ও আম্বেদকরের চিন্তনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন বেশি। তথাপি রাজা ঢালের মতো সমালোচকরা এই সমন্বয় স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেন আমরা গরীব এই জন্য আমরা অচ্ছ্যুৎ এ কথা ঠিক নয়। তাঁর মতে আমরা অচ্ছ্যুৎ এইজন্য আমরা গরীব--- এ কথাই সত্য। আমরা

গরীব তাই আমরা অচ্ছ্যুৎ, এই দাবি করলে ভারতের সব গরীব অচ্ছ্যুৎ হয়ে যেত, কিন্তু তা তো ঠিক নয়। আমাদে ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ হওয়ার মূল কারণ আঙ্গ মাদের দারিদ্র্যে লুকিয়ে নেই। আমাদের দারিদ্র্যের মূল নিহিত আছে আমাদের ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ হওয়াতেই। ঠিক তেমনি আমাদের ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ মূল আজকের বাস্তবে নেই, তা আছে আমাদের ইতিহাসে আর ধর্মে। রাজা ঢালে বলেন ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল না হয়ে হিন্দু ধর্ম ব্যবস্থার ফল। দলিতের দারিদ্র্য ও ছুঁৎমার্গিতার শিকার হওয়ার বাস্তব ভারতের ইতিহাসে শেকড় গেঁড়ে আছে আর সেই কারণেই আজ সেই সমস্যা মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে। ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ সমস্যার স্থান আজ জাতিভেদ প্রথা নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমাদের এও মনে রাখতেহবে যে, এই জাতিভেদের মূল ইতিহাস বা ধর্মে নেই, তা আছে আমাদের আজকের রাজনীতিতে। দলিতের দারিদ্র্যের মূল ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ সংস্কারের মধ্যেই আছে; কিন্তু এমন নয় যে তা কেবল এই বিশেষ সংস্কারের মধ্যেই আছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ, ধর্মান্তরণ, ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ বিরোধী আইন, দলিতের আন্দোলন, প্রগতিশীল আদর্শ, আর জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির কারণে আজকাল ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ সমস্যা তো অনেকটাই কমে আসছে কিন্তু জাতিভেদ প্রথার দানবীয় রূপ আরও দৃঢ়ভাবে থাবা বসাচ্ছে। দলিতের সামাজিক প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে আরও কঠিন হচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে বেকারত্বের ক্রমবৃদ্ধি, দুর্নীতি, জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে সম্পদের সিংহভাগ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা, মরুভূমিপ্রায় গ্রাম প্রান্তর, শহরে বেড়ে চলা নোংরা অস্বাস্থ্যকর বস্তি ইত্যাদি কারণে দুমড়ে-মুচড়ে থাকা দলিতের জীবন কেবলমাত্র ধর্ম ও ইতিহাসের কারণে প্রান্তিক, একথা বলা মানে বৃহৎ সত্যকে অস্বীকার করা, বাস্তবের প্রতি উদাসীন থাকা। আঙ্গ মাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত কিছুর মূল আজকের বিষম ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। দলিতের দারিদ্র্যের মূল ধর্ম আর ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে কিন্তু তার আজকের স্বরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ কথাও মনে রাখতেহবে যে, শাসন ব্যবস্থার জনকল্যাণমূলক যোজনা, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, দলিতের মধ্যে নতুন রূপে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব— ইতাদি কারণে দলিতের দরিদ্রতার মূল আর কেবল ইতিহাস ও ধর্মে নেই, তা আজ আরও জটিল হয়েছে।

দলিতের অর্থনৈতিক দাসত্বের কারণ যদি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় লুকিয়ে

থাকে, তাহলে এই ব্যবস্থা থেকে মুক্তির শেষ পথ অনুসন্ধান করা যাবে মার্ক্সবাদ ও আম্বেদকরবাদের সমন্বয়ের মধ্যে। শহরের ক্রমবৃদ্ধি ও শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদই পারে দলিত ও উচ্চবর্ণকে একসাথে অর্থনৈতিক সাম্যবোধের জ্ঞান এবং সংগঠিত হওয়ার শিক্ষা দিতে। গ্রামে যান্ত্রিকীকরণ ও জমি বিষয়ক নতুন নতুন আইন উদ্ভাবনের জন্য পুরনো জাতিব্যবস্থায় একটি ফাটল দেখা যাচ্ছে এবং একটা নতুন ও জটিল শ্রেণিসম্পর্ক ক্রমশ উদ্ভূত হচ্ছে। পুরনো জাতিব্যবস্থায় ফাটল ধরছে ঠিকই কিন্তু মনে যে জাতিভেদের অস্তিত্ব আছে তার অবলুপ্তি ঘটছে না। সমাজে যখন মানসিক জাতবিভাজন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তখন অন্যদিকে অর্থনৈতিক শোষণ ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীগুলির স্বার্থসিদ্ধির সাধারণ প্রবণতার ফলে একইসঙ্গে বেড়ে চলেছে শ্রেণি বৈষম্য। আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে বামপন্থী আদর্শের ক্রমবর্ধমান বিস্তার যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে জাতিব্যবস্থা নষ্ট হয়ে একদিন সমাজ শাসিত হবে শ্রেণিবিভাজনের কঠোর সত্যের মধ্য দিয়ে।

মার্ক্সবাদ ও আম্বেদকরবাদের সমন্বয় গণ-আন্দোলনকে ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও জনপ্রিয় রূপ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। যে সমস্ত কর্মী, লেখক ও বুদ্ধিজীবী এই সমন্বয়ের পক্ষে তাঁরা মনে করেন, অল্পসংখ্যক দলিতের পক্ষে এই বৃহৎ লড়াই এককভাবে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। এই লড়াই-এ শ্রমিক, মজদুরকেও সঙ্গে নিতে হবে এবং মার্ক্সবাদ এই সম্মিলিত লড়াই-এর পথ দেখাতে পারে। কিন্তু এই সমন্বয়ের বিরোধিতা করেন রাজা ঢালে। তিনি বলেন, ''মার্ক্স, ফুলে, আম্বেদকর এই তিনজনের সমন্বয়ের ভাবনা ফুলে-আম্বেদকরকে মহান করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়নি, বরং মার্ক্সকে মহান হিসাবে তুলে ধরার জন্য এই প্রস্তাব করা হচ্ছে'' (শতাব্দী সাহিত্য সম্মেলন, অধ্যক্ষীয় ভাষণ, ১৮-১৯ জানুয়ারি, ১৯৯২)। রাজা ঢালের এইরকম মার্ক্স বিরোধী হয়ে ওঠার কারণ অনুমেয়। কোনোরকম প্রখর বিরোধিতা কখনো গঠনমূলক হয় না, তা আক্রমণাত্মক, ও হঠকারী হয়ে থাকে। এইরকম বিরোধিতা জন্ম নেয় যেন-তেন প্রকারে নিজের মত প্রতিষ্ঠা ও অন্যের মতকে খণ্ডন করার লোভ থেকে। সাদা-কালো, পুঁজিবাদী-শ্রমিক, উচ্চবর্ণ-দলিত এই সমস্ত বর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ দাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দাবি প্রতিষ্ঠা। সত্যি বলতে কী প্রত্যেক বর্গের দাসত্বের চেহারা স্বতন্ত্র, তথাপি তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া স্বাধীনতা ও সংঘর্ষের ভাবনা একই রকমের। ব্ল্যাক, শ্রমিক আর

দলিতের সংঘর্ষ ন্যায়ের দাবিতে, এইজন্য তাদের আন্দোলনের মধ্যে আর আদর্শের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এইজন্য মার্ক্স ও আম্বেদকরের ভাবনার সমন্বয় খুবই যুক্তিপূর্ণ একটি প্রস্তাব বলে মনে হয়।

দলিত লেখকরা মনে করেন, দলিত সাহিত্যের একমাত্র প্রেরণা আম্বেদকরের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে। তবুও দলিত সাহিত্যে তাঁদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদের প্রথম রূপ দেখা গিয়েছিল মার্ক্সবাদের বিরোধিতা এবং সেই প্রেক্ষিতে বুদ্ধের দর্শনকে দলিত সাহিত্যে মুক্তি পথ হিসাবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে। ভাউসাহেব আডসুল, বিজয় সোনবণে আর রাজা ঢালে বৌদ্ধ আদর্শ মেনে নিয়ে বাবুরাও বাগুল, নামদেও ধসাল, দয়া পাওয়ার প্রমুখ লেখকদের রচনা সাম্যবাদী বলে সমালোচনা করেছেন। অর্জুন ডাংলে, দয়া পাওয়ার ও যশবন্ত মনোহর দলিত লেখকের সাম্যবাদে আস্থা সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে এই মতভেদের কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়েছে। মার্ক্সবাদ ও আম্বেদকরবাদ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। বাবুরাও বাগুল ও যশবন্ত মনোহরকে মার্ক্সবাদী মনে করে গঙ্গাধর পানতাবণে আম্বেদকরবাদের সমর্থন করেন। এই সময়েই রাওসাহেব কসবে রচিত *আম্বেদকর আউর মার্ক্স* (১৯৮৫), বি.স.জোগের *মার্ক্সবাদ আউর দলিত সাহিত্য* (১৯৮৫), শরদ পাটিলের *অব্রাহ্মণী সাহিত্য কা সৌন্দর্যশাস্ত্র* (১৯৮৮) এবং সদা কবহাড়ে রচিত *মার্ক্সবাদ, বুদ্ধবাদ আউর আম্বেদকরবাদ* (১৯৯২) ইত্যাদি গ্রন্থে মার্ক্সবাদ ও আম্বেদকরবাদের সমন্বয়ের কথা বেশ জোরালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আম্বেদকরবাদীদের পক্ষ থেকে এমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। মার্ক্সীয় দর্শনের নিরিখে নির্মিত অর্থনৈতিক কাছামো বিশ্লেষণের সমকক্ষ বা অনুরূপ পদ্ধতি আম্বেদকরবাদীরা প্রস্তাব করতে পারেননি। দলিতের উন্নয়নের প্রশ্নের তো অনেক প্রেক্ষিত রয়েছে। আম্বেদকরের দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে দলিত আন্দোলনকে আম্বেদকরবাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে আম্বেদকরবাদীরা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এটাই সত্যি যে আম্বেদকরবাদীদের পক্ষে তা করাও সম্ভব ছিল না। বাবাসাহেব আম্বেদকর মার্ক্সের বিরোধিতা করেছেন, সেইজন্য মার্ক্সের বিরোধী ব্যক্তিরাও বিরোধিতার ভূমিকা পালন করতে থাকেন। তাঁরা আম্বেদকরবাদকে বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত থেকে বিকশিত করতেও পারেননি। পরবর্তীকালে এই মতভেদ অন্যরকম মোড় নেয়। দলিত তাত্ত্বিকদের মধ্যে হিন্দুত্ববাদ বনাম আম্বেদকরবাদ-এর চর্চা শুরু হয়।

যশবন্ত মনোহর আম্বেদকরবাদকে স্বীকার করে গঙ্গাধর পানতাবণকে হিন্দুত্ববাদী বলে অভিযুক্ত করেন, কারণ এই সময় গঙ্গাধর পানতাবণে 'সমরসতা মঞ্চ' নামক হিন্দুত্ববাদীদের একটি মঞ্চে গিয়ে ভাষণ দিয়ে আসেন। হিন্দুত্ববাদীরা ড. হেডগেবার ও ড. আম্বেদকরের মধ্যে তুলনা করা শুরু করে দেন। রামনাথ চবহান, বালাসাহেব গায়কোয়াড় ও টেক্সাস গায়কোয়াড় প্রমুখ দলিত লেখ করা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের মঞ্চে গিয়ে নিজেদের মতামত রেখে এসেছেন। এইজন্য হিন্দুত্ববাদ বনাম আম্বেদকরবাদের চর্চা শুরু হয় দলিত সাহিত্য ও আন্দোলনের বৃত্তে। এই চর্চা গঙ্গাধর পানতাবণের বিরুদ্ধে যশবন্ত মনোহরের যুক্তিকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। অন্তত এই প্রশ্নগুলো বিশেষভাবে উঠে আসে, যেমন--- 'যথার্থ আম্বেদকরবাদী কে?' অর্থাৎ, 'আমি নাকি তুই'? এত দূর এই বিতর্ক চলে গিয়েছিল। লক্ষণ মানে, পার্থ পোলকে, অর্জুন ডাংলে, বাবুলাও বাগুল, বিলাস বাঘ আর রাওসাহেব কসবে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ভূ মিকা গ্রহণ করেছিলেন।

দলিত লেখকদের মধ্যে মতভেদ কখনো বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক ছিল না। তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বেষ, নেতৃত্ব দেওয়ার বাসনা, স্বার্থ পূরণের চেষ্টা ইত্যাদি ছিল প্রবল, সেইজন্য এই মতভেদের কোনো কেন্দ্র লক্ষ্য ছিল না। একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেই তা আবর্তিত হত। এই মতভেদ সেই সময়ের খবরের কাগজগুলোতেও বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত বিতর্ক কখনোই বৌদ্ধিক বিতর্কের সম্মান পায়নি। এই সমস্ত বিতর্ক ও মতভেদ বিষয়ে গম্ভীর কোনো গবেষণা বা লেখালেখিও হয়নি।

সাহিত্যে সাম্যবাদী আদর্শ এসেছে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের দর্শন থেকে আর আম্বেদকরবাদী আদর্শ এসেছে বাবাসাহেব আম্বেদকরের দর্শন থেকে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে খুব একটা কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেননি। তাঁদের অন্যান্য লেখালেখি থেকেই সাহিত্য সম্পর্কে মার্ক্স এঙ্গেলসের ভাবনা অনুসন্ধান করতে হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকর সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে খুব বেশি লেখালেখি করেননি। তাঁরও কিছু লেখালেখি থেকে সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনা জানতে পারা যায়। সাম্যবাদী দর্শন ও দলিত দর্শনের মধ্যে নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়।

সাম্যবাদী সমালোচনা ও দলিত সমালোচনা, এই দুই ধারাই একটি নিশ্চিত বৌদ্ধিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃসৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে জন্ম

নেওয়ার কারণে মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনা মানবীয় জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে এবং একটি প্রগতিশীল সমাজের রূপরেখা আঁকতে পারে। কারণ মার্ক্সবাদ শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখানো এক মানবতাবাদী আদর্শ, এইজন্য সাম্যবাদী সাহিত্য সমালোচনা সাম্যবাদী জীবন-দর্শনের আধারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সমালোচনা পদ্ধতি একটি নিশ্চিত দর্শনের আধারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনানুসারে এই সমালোচনা পদ্ধতির একটি দৃঢ়, স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে, মার্ক্স-এঙ্গেলসের দর্শন স্থির নয়, তা আমাদের কর্মে প্রাণিত করে। সেই দর্শন নির্ভর আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের বিষয়, ব্যক্তি জীবনের রেখা আর মানবিক সম্পর্কের মূল্যায়ণ করে (*সাহিত্য আউর কলা*, পৃ-২৮২)। দয়া পাওয়ার দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গে একই ভূমিকা নিয়েছেন যে ভূমিকা গোর্কি নিয়েছিলেন সাম্যবাদী সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিনের দর্শন বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে। দয়া পাওয়ার বলেন, ''ফুলে, আম্বেদকর আর মার্ক্সের তত্ত্বজ্ঞানের আধারে আমরা নিজেরা নিজেদের শোষিত জীবনসত্য স্পষ্টভাবে দেখতে পাই'' (ভুই কোট, সোলপুর, ১৯৯০, পৃ-৭৭)। দয়া পাওয়ার মনে করেন যে, শোষণ মুক্তির প্রসঙ্গ আমাদের সাহিত্যে কীভাবে ব্যক্ত হবে তা লেখককে বিচার করতে হবে। সাম্যবাদী লেখক ও সমালোচকরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সাম্যবাদী সাহিত্য হোক বা সাম্যবাদী দর্শন নির্ভর সমালোচনা পদ্ধতি, এ দুইয়ের মধ্য দিয়েই শোষণ বিরোধী ভাবনা প্রকাশিত হতে হবে।

মার্ক্সবাদী সাহিত্য ও দলিত সাহিত্য বিশেষ, দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত সৃষ্টি, ফলত এই দুই ধরনের সাহিত্যের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট। মার্ক্স ও আম্বেদকরের আঙ্গ দর্শ মানব-মুক্তির আদর্শ। এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত রচনাও লক্ষ্যের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকে। সাম্যবাদী সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেন, ''মানুষের মধ্যে শ্রেণি চেতনা জাগ্রত করা, ব্যক্তির শ্রেণি অবস্থানের সঙ্গে তার দৃষ্টিকোণের সম্বন্ধ নির্মাণ করা, এই সবই শিল্পের লক্ষ্য'' (*সাহিত্য আউর কলা*, পৃ- ২৫১)। মানুষকে বিপ্লবের প্রতি আগ্রহী করে তোলা সাম্যবাদী সাহিত্যে লক্ষ্য। এইরকম অভিমত তারাচন্দ্র খান্ডেকর দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ''একটি সমাজে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। যে আদর্শের শক্তিতে

প্রেরিত হয়ে মানুষ বিপ্লবের স্বপনে দেখবে সেই আদর্শ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত''। (*আম্বেদকর তত্ত্বজ্ঞান প্রচিতি আউর আবিষ্কার*, পৃ-৮)। সাম্যবাদী লেখক ও দলিত লেখক শোষিতের পক্ষ অবলম্বন করেন। মানুষকে তার দাসত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া সাহিত্যের প্রধান কর্তব্য। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের যথার্থ জ্ঞান লাভ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা সমালোচনার কাজ। এই ধরনের সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্য হল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সৃজনশীল শিল্পকৃতি, বিপ্লবের পথ নির্ধারণ, সাহস ও বৈপ্লবিক গুণ ব্যক্ত হল কিনা তা দেখা।

মার্ক্সবাদী সাহ্যিত ও দলিত সাহিত্য, এই দুই সাহিত্য ধারাই জীবনবাদী সাহিত্য ধারা। মার্ক্সবাদী সাহিত্য বস্তুবাদী সাহিত্য। দলিত সাহিত্যও বস্তুবাদী। এই সাহিত্যের পথ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। পাঠকের মনোরঞ্জন করার জন্য এই সাহিত্য লিখিত হয় না। দলিত সাহিত্য যথার্থই অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। 'জীবনবাদ' এই শব্দের থেকেও দলিত সাহিত্যের জীবনবাদ অনেক গভীর। মারাঠি সাহিত্যের মধ্যবিত্ত লেখকদের মধ্যে জীবনবাদ অনেক কম মাত্রায় ব্যপ্ত হয়েছে। বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, পুনর্বিবাহ, প্রৌঢ়-বিবাহ, প্রেম-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পাতিব্রাত্য, কঠিন বৈধব্য, স্ত্রী শিক্ষা, নিষেধাজ্ঞা, পণপ্রথা ইত্যাদি বিষয় মারাঠি সাহিত্যে জীবনবাদের নিদর্শনরূপে এসেছে। ভারতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ জীবনবাদী বিষয় নির্মাণ করার ঐতিহাসিক কাজ দলিত সাহিত্যিকদেরই করতে হবে। মার্ক্স-এঙ্গেলস মনে করেন বস্তুবাদই বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। দলিত সাহিত্যিকও কলাকৈবল্যবাদকে অস্বীকার করেন এবং জীবনবাদকে সাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মার্গ বলে মনে করেন।

মার্ক্সবাদী সাহিত্য ও দলিত সাহিত্য জীবনবাদী। এই দুই সাহিত্যই মনে করে সাহিত্য কেবল সাহিত্যের জন্য নয়। কিন্তু এই সাহিত্য দর্শন শিল্পের মূল্যকে কখনো অস্বীকার করে না এবং সেইজন্য সাহিত্য ও শিল্প নির্মাণে সাহিত্যিক বা শিল্পী অত্যন্ত যত্নবান। মিন্না কাটস্কিকে লেখা একটা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেন, ''আমার যা লক্ষ্য তা পাঠককে একেবারে খুলে না বলে, প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনার সাপেক্ষে সেই লক্ষ্য বিবৃত করা উচিত'' (*মার্ক্স এঙ্গেলস সাহিত্য আউর কলা*, পৃ-১৬)। অর্থাৎ সাহিত্য একেবারে খুলে তার আদর্শ প্রকাশ করবে বা প্রোপাগান্ডিস্ট হবে, মার্ক্সবাদ এরকম মনে করে না। এই প্রসঙ্গে গোর্কি বলেন, ''আমাদের মহান লেখকদের লেখালেখির মধ্যে রোমান্টিকতা ও বাস্তববাদ

অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এইজন্য তাঁদের লেখার মধ্যে একটি আভিজাত্য এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যে তাঁদের লেখালেখির ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে'' (*সংস্কৃতি কে উত্তরাধিকারিয়ো! তুম কিনকে সাথ হো?* পৃ-৬৭)। গোর্কি সাহিত্যের আভিজাত্য প্রসঙ্গে সচেতন। মার্ক্সবাদ সাহিত্যকে সাধন না মনে করে সাধ্য হিসাবে বিবেচনা করে। দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গে যশবন্ত মনোহর বলেন, ''শ্রেষ্ঠ জীবনমূল্য ও শিল্প মূল্যের এক অপূর্ব সরস সমাহার ভবিষ্যতে যে সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যাবে সেই সাহিত্য দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্যে আখ্যায়িত বৈপ্লবিক শিল্পচেতনা মারাঠি সাহিত্যের ইতিহাসকে গৌরবের মহিমা দেবে'' (*দলিত সাহিত্য সিদ্ধান্ত আউর স্বরূপ*, পৃ-৬২১)। যশবন্ত মনোহর জীবনমূল্য ও শিল্পমূল্য এই দুই ভাবনাকেই মহৎ সাহিত্যের নির্মাতা হিসাবে দেখেছেন। এই ভাবনা এঙ্গেলস ও গোর্কির সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করে।

মার্ক্সবাদী সাহিত্য ও দলিত সাহিত্য মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। মানুষের মহত্বের ধারণা এই দুই সাহিত্য ধারার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। মার্ক্সবাদ আসলে একটি মানবতাবাদী দর্শনই। শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু তো মানুষ। গোর্কি বলেন, ''আমাদের সংসারে যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি তা সব মানুষেরই শ্রম দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ নৈসর্গিক শক্তির ভাবী মালিক মানুষ নিজেই'' (*সংস্কৃতি কে উত্তরাধিকারিয়ো! তুম কিনকে সাথ হো?* পৃ-৯৮-৯৯)। ম্যাক্সিম গোর্কি মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। দলিত লেখকরা তো মনে করেন যে, ইহলোকে মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো ঐহিক বা কাল্পনিক বস্তু নেই। দলিত সাহিত্য ও মার্ক্সবাদী সাহিত্য এই দুই-এরই কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। এইজন্য এই দুই সাহিত্যে প্রেরণা, ভূমিকা আর প্রতিজ্ঞার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ এবং মানুষের মুক্তি এই দুই সাহিত্যের সমালোচনায় বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

দলিত ও মার্ক্সবাদী সাহিত্যের নায়ক মানুষ। এই নায়ক সাহিত্যে নতুন। প্রচলিত সাহিত্যে এই নায়ক হারিয়ে গেছে। প্রচলিত সাহিত্য সাধারণ মানুষের মধ্যে কখনো নায়কোচিত লক্ষণ দেখেনি। এই প্রসঙ্গে এ. লিইজেরভ বলেন, ''সমাজবাদী সাহিত্য কেবলমাত্র বৈপ্লবিক, লড়াকু, সৃষ্টিকারী নতুন নায়ককে সামনে নিয়ে আসেনি, তার প্রতিভা এই নায়কের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য ও বিশেষতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। শিল্পের ইতিহাসে এতদিন এমন সাহিত্যিক ছিল অজ্ঞাতপূর্ব'' (*মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সৌন্দর্যবিজ্ঞান আউর জীবন*, পৃ- ৬২১)।

এই আদর্শই দলিত সাহ্যিত পড়ার সময় নজরে আসে। দলিত সাহিত্য প্রসঙ্গে বাবুরাও গায়কোয়াড় বলেন, ''দেশের জন্য লড়াই-এ সমস্ত জাতি ধর্মের মানুষই ছিল, কিন্তু নীচের স্তরের অচ্ছ্যুৎ মানুষ এই ইতিহাসের আখ্যানে কখ নো নায়ক হয়নি। এইজন্য আধুনিক মারাঠি সাহিত্যে দলিতের ছবি কখনো ফুটে ওঠেনি'' (দৃষ্টি, পৃ-৬৮১)।

দলিত ও মার্ক্সবাদী সাহিত্য আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল এমন মানুষকে সাহিত্যের নায়ক বানিয়েছে। আর এই সাহিত্যের সমালোচনা এই নতুন নায়ককে নায়কত্ব দিয়েছে এবং তার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাধারণ মানুষের মুক্তির লড়াইকে সমর্থন করা, এই আদর্শ মানুষের শোষণমূলক প্রবৃত্তি, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি আর রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কড়া চাবুকাঘাত করেছে।

দলিত সাহিত্য আর মার্ক্সবাদী সাহিত্য বস্তু নির্মাণে নিশ্চিত এবং তার লক্ষও নির্দিষ্ট, এইজন্য এই দুই সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রয়োজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। এই দুই সাহিত্যের প্রেরণা, ভূমিকা, প্রতিবদ্ধতা মানবতাবাদ থেকে এসেছে। দলিত লেখকরা এই মানবতাবাদকে আম্বেদকরবাদ ও মার্ক্সবাদী লেখকরা এই মানবতাবাদকে মার্ক্সবাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। এই দুই বিচারধারায়, আন্দোলনে, সাহিত্যে, সমাজে সাধারণ মানুষের মুক্তি আর মহানতার আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। দেশ, প্রদেশ, ভাষা আর পরিস্থিতিতে ভিন্নতা দেখা গেলেও এই দুই সাহিত্যের ভূমিকায় যে একতা দেখা যায় তা শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবনা, মানুষের মুক্তির সমর্থন আর মানুষের মহানতাকেই সম্মান প্রদর্শন করে।

দলিত সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই মার্ক্সীয় ও আম্বেদকরবাদী সমালোচনা পদ্ধতিতে দলিত সাহিত্যের সমালোচনা হয়েছে। দলিত সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের কালে সাহিত্যিক ও সমালোচক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্র. শ্রী. নেরুরকর, গ. বা. সরদার. শরৎচন্দ্র মুক্তিবোধ, নরহর কুরুন্দকর, সুধীর বেডেকর, শরদ পাটিল, নারায়ণ সুর্বে, সদা কবহড়ে, বি.স. জোগ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি দলিত সাহিত্যের সমর্থন করেন। মার্ক্সবাদী ও সমাজবাদী ব্যক্তিবর্গ দলিত সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। ম.ন.বানখড়ে, বাবুরাও বাগুল, যশবন্ত মনোহর, রাওসাহেব কসবে, অর্জুন ডাংলে, নামদেও ধসাল, দয়া পাওয়ার প্রমুখ দলিত সাহিত্যের সমালোচনা

করার সময় মার্ক্সবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ করেন।

দলিত অর্থাৎ তফশীলি জাতি বা উপজাতি নয়, সমস্ত শোষিত মানুষই দলিত— এইরকম পরিভাষা ব্যাখ্যা করেছেন মার্ক্সবাদী সমালোচক। ম.ন. বানখড়ে বলেন, ''দলিত শব্দের পরিভাষা কেবল বৌদ্ধ অথবা পিছিয়ে পড়া মানুষ নয়, যে মানুষ শোষিত, যে মানুষ শ্রমজীবী, তারা প্রত্যেকেই 'দলিত' শব্দের পরিভাষায় সম্মিলিত'' (*দলিতো কা বিদ্রোহী বাঙ্‌ময়*, পৃ-৭৩)। একই রকমের পরিভাষা নির্মাণ করেছেন নামদেও ধসাল। তিনি বলেন, ''দলিত, অর্থাৎ তফশীলি জাতি, উপজাতি, বৌদ্ধ, শ্রমিক, মজদুর, ভূমিহীন, খেত মজুর, যাযাবর ও আদিবাসী'' (দলিত প্যান্থার কা জাহিরনামা(। বানখড়ে ও ধসাল সমস্ত দুর্বল শ্রেণিকে তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে এনেছেন। কেবল অচ্ছ্যুৎ, বহিষ্কৃত জাতিই দলিত এমন তাঁরা মনে করেন না। এই পরিভাষা ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যবোধ থেকে নির্মিত হয়েছে। হয়তো এই পরিভাষা কেবলমাত্র একটি পরিভাষা নয়, লড়াই-এর প্রস্তুতিকল্পে একটি মোর্চা। শোষিতের জাত হল সে শোষিত। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ, যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক প্রভৃতি শোষণের শিকার তারা প্রত্যেকেই দলিত। 'দলিত' পরিভাষার ব্যপ্তি এতটাই।

বানখড়ে ও ধসাল শোষিতকে দলিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এত বৃহৎ পরিভাষা মার্ক্সবাদ বিরোধীরা স্বীকৃতি দেন না। 'দলিত' শব্দের সর্বগ্রাহ্য পরিভাষা অচ্ছ্যুৎ জাতি ও যাযাবর জনজাতির অন্তর্ভুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ কথা বলা যাবে না যে বানখড়ে বা ধসাল প্রদত্ত পরিভাষা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের কথা মাথায় রেখে বানখড়ে ও ধসাল সামাজিক জাগৃতি ও মানুষের সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কল্পনা করে 'দলিত' শব্দের এই ব্যপ্ত পরিভাষা নির্মাণ করেন। আজ ভারতের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে যেভাবে উচ্চস্বরে 'বহুজনবাদ'-এর ভাষা ও কথা শোনা যাচ্ছে তার নিনাদ তো প্রথমে শোনা গিয়েছিল বানখড়ে, ধসাল প্রমুখের পরিভাষার মধ্য দিয়ে। দলিত সাহিত্যকে একটি আন্দোলন হিসাবে যদি মনে করা হয়, তাহলে বানখড়ে ও ধসালের ভূমিকা দলিত- বহুজনের মুক্তির পথ নির্মাণে ব্যাপক হিসাবেই চিহ্নিত হয়।

দলিত চেতনা শুধু বর্ণাশ্রম ধর্মবিরোধী আর মার্ক্সবাদী চেতনা পুঁজিবাদ বিরোধী, এই রকমের বিভাজন করা উচিত নয়। পুঁজিবাদী পরিস্থিতিতে

মার্ক্সবাদী চেতনার জন্ম হয় তো ব্রাহ্মণ্যবাদী কাঠামোতে দলিত চেতনার জন্ম হয়। এইজন্য এই দাবি ব্যর্থ বলে মনে হয় যে, মার্ক্সবাদী চেতনা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং দলিত চেতনা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না, কারণ একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে এই দু'টি চেতনার উদ্ভবের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার মানে এমন নয় যে এই দুই চেতনা একে অপরের জন্য ক্ষতিকারক বা পরস্পরবিরোধী। মার্ক্সবাদী চেতনা যে বিষম পরিস্থিতিতে জন্ম নেয়, সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে, এবং দলিত চেতনা যে বিষম পরিস্থিতির মধ্যে জন্ম নেয় সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। একথা মনে রাখতে হবে যে, এই দুই চেতনাই বিষমতার বিরুদ্ধে। তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য তো এক, ''মানুষকে মুক্তি দিতে হবে''।

যেভাবে একটি দেশের সেনা অনেক ঘাঁটিতে থেকে বিদেশি শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেইভাবে এই চেতনাও কাজ করে। যেমনভাবে বিভিন ঘাঁটিতে ছড়িয়ে থাকা সেনারা আসলে একই দেশের জন্য লড়াই করছে ঠিক তেমনই বিভিন্ন রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষেত্র থেকে তৈরি হওয়া চেতনা লড়াই করছে, সেই সমস্ত চেতনারই লক্ষ্য এক, মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা। দলিত চেতনা, মার্ক্সবাদী চেতনা ও নিগ্রো চেতনা ভিন্ন ভিন্ন রকমের, তাদের যুদ্ধক্ষেত্রও ভিন্ন, কিন্তু তাদের অন্তিম লক্ষ্য মানবমুক্তি। এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলা বিভিন্ন আন্দোলনে বৈষম্য-বিরোধী চেতনা একে অন্যের কতটা পরিপূরক আমরা তা বুঝতে পারি।

দলিতের সমস্যা কেবল সামাজিক নয়, তা অর্থনৈতিকও বটে। দলিতের সমস্যা আর্থিক সামাজিক দিক থেকে ভিন্ন ভাবে দেখলেও এই মত প্রত্যাখ্যান করা যাবে না যে দলিতের সমস্যা আর্থিকও বটে। আজও অচ্ছ্যুতের ওপর অত্যাচার হয়। এই অত্যাচারের অনেক কারণই অর্থনৈতিক। বেঁচে থাকার জন্য তাদের এমন একটি শ্রেণির কৃপা বা দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হয় যে শ্রেণি সবসময়ই স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার নেশায় মেতে আছে। আজকের দলিত ভূমিহীন, সে ক্ষেত মজুর। তার নিজের কোনো ব্যবসা নেই, উৎপাদনের ভূমি নেই। যতদিন না সে নিজের পায়ে সক্ষমভাবে দাঁড়াতে পারবে ততদিন অনুরোধ-উপরোধ করে, নীচু কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। মুক্তির জন্য দলিতকে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করতে হবে অথবা শ্রেণি সংগ্রাম ও জাতি আন্দোলনের আহ্বান একসঙ্গে করতে হবে।

জাতিভেদ প্রথা থেকে মুক্ত হওয়া দলিত আর্থিক বৈষম্য থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে? দলিত যে কেবল অচ্ছ্যুৎ তাই-ই নয়, সে গরীবও বটে। তার অস্পৃশ্যতা শেষ হওয়া প্রয়োজন। কেবল ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ দূর হওয়াতেই দলিতের দাসত্ব থেকে মুক্তি ঘটবে না। এইজন্যই তাকে শ্রেণি সংগ্রাম করতে হবে।

হাজার হাজার বছর ধরে এই জাতিভেদ প্রথা চলে আসছে। এর কারণ হল প্রত্যেক জাতির ব্যবসা অপরিবর্তনীয় ছিল। প্রত্যেক জাতি ব্যবসা বংশপরম্পরায় চলে এসেছে। জীবিকার জন্য নতুন কোনো পথের সন্ধান দেখা যায়নি। ব্রিটিশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান এল। এই কারণে জাতিভেদ প্রথায় একটু শিথিলতা এল। মানুষের জীবিকার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল।

ইংরেজের জন্য অচ্ছ্যুৎ-এরও শিক্ষার সুযোগ মিলল এবং সেনাবাহিনীতে তারা যোগদান করার অধিকার পেল। এর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক হিসাবে বন্দর, রেল, টেলিগ্রাম ও ডাক বিভাগে তাদের প্রবেশ শুরু হল। ফলত পারম্পরিক জীবিকা পরিবর্তিত হল এবং দলিতের জীবনে নতুন সমস্যা তৈরি হল। দলিতের সামাজিক সমস্যার পাশাপশি আর্থিক সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করল। দলিত আন্দোলনের মাধ্যমে দলিতের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার সামাজিক লড়াই-এর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার ফলে তাদের আর্থিক প্রশ্ন উত্তরহীন হয়ে থাকল। দাদাসাহেব গায়কোয়াড় ভূমিহীন কৃষকদের সত্যাগ্রহ সংঘটিত করেন। দলিত প্যান্থাররা আন্দোলন করে ইনামি জমির জন্য। দলিতের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সমস্যা খুব সামান্যই এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজে পেয়েছিল। মরাঠবাড়া বিদ্যাপীঠের নাম পরিবর্তিত করে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের নামে চিহ্নিত করার দাবিতে দীর্ঘ পনেরো বছর দলিত প্যান্থার আন্দোলন করে, ফলত তারা দলিতের আর্থিক প্রশ্নের দিকে নজর দিতে পারেনি। রিপাবলিকান পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠিভাগ ও ক্ষমতার লোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দলিতের আর্থিক সমস্যার দিকে তাদের যতটা নজর দেওয়া উচিত ছিল তা তারা দেয়নি। সেইজন্য দলিতের আর্থিক সমস্যা আরও বেড়ে চলে। দলিত সাহিত্য ও আন্দোলনে মার্ক্সবাদের প্রভাব বাড়তে শুরু করেছিল, সেইভাবে যাতে না বাড়ে সেই প্রয়াসও এই দলিত বৃত্তের মধ্য থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ের প্রশ্নও বারবার আলোচিত হয়েছে।

দলিত সাহিত্য ও মার্ক্সবাদী সাহিত্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই দু'ধরনের সাহিত্যের তুলনা করা যেতে পারে। মার্ক্সবাদী লেখক ও দলিত লেখকের ভূমিকা সমাজে অনেক দিক থেকেই একই রকমের। আর্থিক বৈষম্য ধ্বংস করার জন্য পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন মার্ক্সবাদী সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিক। সামাজিক বৈষম্য নষ্ট করার জন্য দলিত সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী ও সাহিত্যিক স্বপ্ন দেখেন। মার্ক্সবাদী লেখকরা মনে করেন যে মানুষ শোষণমুক্ত হোক। দলিত লেখকরা মনে করেন মানুষ 'তুচ্ছতা'র এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হোক। মানুষকে মানুষ হিসাবেই বাঁচতে দেওয়া উচিত। এই দুই দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ মনে করেন যে দুই দর্শনেই মানুষের মুক্তির সমস্ত পথ খোলা আছে। এই দুই সাহিত্যে মানুষই হল কেন্দ্রবিন্দু। বৈষম্য বিরোধী ভাবনা প্রতিজ্ঞা হয়ে দলিত ও মার্ক্সবাদী লেখকদের সাহিত্য রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। এই দু'ধরনের সাহিত্যই বাস্তববাদী ও জীবনবাদী সাহিত্য।

মার্ক্স, আম্বেদকর আর বুদ্ধদেবের আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু সাধারণ মানুষ এবং মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই এই তিন আদর্শের লক্ষ্য। এই ভাবনা রাওসাহেব কসবের *আম্বেদকর আউর মার্ক্স*, শরদ পাটিলের *অব্রাহ্মণী সাহিত্য কা সৌন্দর্যশাস্ত্র* এবং সদা কবহাড়ের *মার্ক্সবাদ, বুদ্ধবাদ আউর আঙ্গ স্বেদকরবাদ* নামক গবেষণা গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। দলিতকে প্রত্যক্ষ লড়াই যদি করতেই হয়, তাহলে দলিত শ্রমিকের সমস্যা এড়িয়ে গেলে চলবে না। তারাও যে এই আন্দোলনের অংশ সেই সত্য বুঝতে হবে। কারণ এই মুক্তির লড়াই একা কোনো জাতি বা উপজাতি, একা কোনো ধর্ম বা ধর্মপথ, একটি অঞ্চল বা সেই অঞ্চলের কিছু গোষ্ঠী এককভাবে লড়তে পারবে না। এইজন্য জাতিব্যবস্থা বিনাশকামী আম্বেদকরবাদ এবং বর্গব্যবস্থা ধ্বংস করার পথ দেখানো মার্ক্সবাদ, এই দুই চিন্তনের সমন্বয়ে নতুন পথ নির্মিত হওয়া প্রয়োজন।

ডাফোড্রাম - মহারাষ্ট্র শাসা আয়োজিত নরেন্দ্র দাভলকর স্মারক বক্তৃতায় পঠিত

বৌদ্ধ দর্শন, মার্ক্সবাদ ও ড. আম্বেদকর

অর্জুন ডাঙলে

ড. আম্বেদকর, বৌদ্ধধর্ম ও মার্ক্সবাদের দর্শনগুলির মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য নিয়ে এখন আলোচনা করা প্রয়োজন। কেউ কেউ মনে করেন যে অম্বেদকরবাদ ও বৌদ্ধধর্ম মার্ক্সবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিভিন্ন সময়ে এই ইস্যুতেই দলিত আন্দোলনে বিভাজন হয়েছে। ১৯৭৫ সালে একই কারণে ভেঙে গেছে দলিত প্যান্থার। দলিত সাহিত্য আন্দোলনে দুটি মূল ধারা দেখা যায় একদল মনে করেন আম্বেদকর ও বুদ্ধের দর্শন স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যরা কমিউনিজম ও সমাজবাদের সাহায্য নিতে চান।

ড. আম্বেদকর মার্ক্সবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন না। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে বৌদ্ধধর্ম ও কমিউনিজম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে মার্ক্সবাদ ক্ষমতা দখলের জন্য হিংসাকে প্রত্যাখ্যান করে না, বৌদ্ধ দর্শন অহিংসা, দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদির ওপর জোর দেয়।

এমনকি আগেও ১৯৫৪ সালের ২৮-এ অক্টোবর ড. আম্বেদকর বোম্বাইয়ের পুরন্দর স্টেডিয়ামে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, 'যেখানে ইচ্ছা অন্যদের যেতে দাও। আমরা জ্যোতিবা-এর পথ অনুসরণ করব। আমরা মার্ক্সকে গ্রহণ করতে পারি, না-ও গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু জ্যোতিবা-এর দর্শন আমরা ছাড়ব না'। এর মানে এই নয় যে আম্বেদকর মার্ক্সবাদকে সমর্থন করেছেন, তবে তিনি তার অন্ধবিরোধী ছিলেন না। গণতন্ত্রে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁর কাছে এটা একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মাত্র নয় বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমতাবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উপায়। এর জন্য তিনি সারাজীবন নির্ভয়ে লড়াই করেছেন। দলিত সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র আম্বেদকরবাদ, মার্ক্সবাদ ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বিতর্ক কেন এটা জানা খুবই প্রয়োজন। গান্ধী, গোলওয়ালকর বা

হিটলারের দর্শন নিয়ে সমান্তরাল আলোচনা নেই কেন?

উত্তরটি খুব সহজ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষিত সাধারণ মানুষই দলিত সাহিত্যের প্রেরণার উৎস যা আবার ড. আম্বেদকরের আন্দোলনেরও কেন্দ্রবিন্দু। মার্ক্সবাদ এই ধরনের শোষণের চারপাশেই ঘোরাফেরা করে এবং বৌদ্ধ দর্শনও সাধারণ মানুষ ও তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে। বিকাশের সময় এই দর্শনগুলি তৎকালীন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কীভাবে মানুষর উন্নতি বিধান করা যায় তা নিয়ে এই উভয় দর্শনই বিচার-বিবেচনা করেছে এবং স্থান ও সময় বিশেষে যখন এদের আলাদা মনে হয়েছে তখনও দুটি দর্শনেরই মর্মবস্তু এক— শোষণ থেকে মুক্তি। দলিত সাহিত্যও শোষণের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে ব্যক্ত এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়া। একারণে আমি বিশ্বাস করি যে এই তিনটি দর্শনই পরস্পরবিরোধী নয় বরং একটি আরেকটি পরিপূরক। একথা বলতে গিয়ে আমি বৌদ্ধ ধর্ম ও মার্ক্সবাদের মূল দর্শনের কথাই বিবেচনা করছি। এখনকার বা অন্যদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন সম্পর্কে কিংবা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের আচরণ ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করিনি।

প্রকৃতপক্ষে আমি বিশ্বাস করি যে, দর্শন বা শোষণের বিরুদ্ধে প্রচাররত সমধর্মী দার্শনিক গোষ্ঠীর ভাবনা দলিত সাহিত্যের পরিপূরক। সৃজনশীল কাজে দর্শনের প্রয়োগ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে। যে দর্শনের মূল নিয়ম বা বিশদ বর্ণনা সৃজনশীল কাজে হুবহু বিবৃত করা যায় না। দর্শন বা সমধর্মী দার্শনিক গোষ্ঠীর ভাবনা শিল্পীর চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে আর এই সম্পর্ক থেকে উৎসারিত হয় যে সৃষ্টি তার থাকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়া ও মানুষকে মুক্ত করার আহ্বানই হচ্ছে আম্বেদকরবাদের মর্মবস্তু। এই মর্মবস্তুর প্রেক্ষাপটে কোনো দলিত সাহিত্য কর্মের বিচার করলে শিল্পকর্মটির প্রতি সুবিচার করা হবে। যাই হোক আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পরিবর্তনকামী কোনো শিল্পীর অন্ধভাবে বা চোখে ঠুলি পরে কোনো দর্শন অনুসরণ করা উচিত নয়।

ভাষান্তর- মনোতোষ চক্রবর্তী

রামরাজ্য ও আম্বেদকর

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

২০১৯-এর নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই দেশের, বিশেষ করে গো-বলয়ের, আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে রামধ্বনিতে। সব আলোচনার শিরোনাম এখন রাম। রাম মন্দিরের সঙ্গে আবার নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে রামের মূর্তি। বেশ মজা লাগে, তাই না! সেই ঠাকুরমার ঝুলির জীয়নকাঠি- মরণকাঠির গল্পের মত। ভোটের ঠিক আগে জেগে ওঠে রাম মন্দিরের দাবি--- সব বড় বড় সাধু-মহান্তরা আবির্ভূত হন টিভির পর্দায়, খ বরের কাগজের পাতায়। ভোট হয়ে গেলে সব চুপচাপ। কে যে নাড়ায় মরণকাঠি- জীয়নকাঠি সবাই জানে, কিন্তু তাদের নাম প্রকাশ্যে আসে না। পুরো বিষয়টাই বিস্ময়কর লাগে এই ভেবে যে রামচন্দ্র বলে কোন যুগে আদতে কেউ ছিলেন কি না তারই ঠিক নেই অথচ সেই ব্যক্তিরই তথাকথিত জন্মস্থান নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুধু যে হচ্ছে তাই নয়, এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে একশো তিরিশ কোটি লোকের এই বিশাল দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি। ভারতবর্ষের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে রামচন্দ্র নিঃসন্দেহে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন বাল্মীকির অমর মহাকাব্যের নায়ক চরিত্র হিসাবে। একথা অনস্বীকার্য যে বাল্মীকির মহাকাব্য মহাকালের অমোঘ গতিকে পরাভূত করে কোন সে অনাদিকাল থেকে বহুরূপে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অভিন্ন অংশ হয়ে আজও আমাদের ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে।

সমাজ, সংস্কৃতি, জনগণ আর সময়ের নানা ঘটনাবলীকে সুন্দরভাবে আঞ্ছাদিত করে শব্দ আর প্রতিচ্ছবির সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে যে সুন্দর কাঠামো রচিত হয় সেগুলিই হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী। লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, এমনকি দেশ দেশান্তরেও ছড়িয়ে পড়ে এইসব কাহিনী। আর স্থান-কাল-বক্তা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব কাহিনী ঋদ্ধ হয়ে ওঠে আরও নতুন নতুন সংযোজনের মাধ্যমে। সেইজন্য

যে কোনো পৌরাণিক কাহিনীকে আমরা কোনো এক নির্দিষ্ট রূপে পাই না, পাই বিভিন্ন রূপভেদে, বিভিন্ন ছন্দে-অভিব্যক্তিতে। এমনকি মূল রচনার আপাত-বিপরীত রূপেও একে দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনী সেই কারণে কখনই ইতিহাস হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না, যদিও ইতিহাস রচনার উল্লেখ যোগ্য কিছু উপাদান এর মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে। পৌরাণিক কাহিনী তার অন্তর্নিহিত কাব্যগুণ আর চিত্রকল্পের বিশিষ্টতার জন্য বহু যুগ ধরে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে সমাদৃত হতে হতে একসময়ে মহাকাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

রামচন্দ্র নামে বাস্তবে কোনো ব্যক্তি ছিলেন কিনা, না তিনি একান্তই মহাকবি বাল্মীকির এক কল্পসৃষ্টি এটা বিদগ্ধ পণ্ডিতদের আলোচনার বিষয়। কিন্তু তিনি বাস্তব বা মহাকবির কল্পিত এক চরিত্র যাই হোন না কেন, ভারতবাসীর এক বিরাট অংশের মানুষের মনে রামের চরিত্র ও রাজ্যশাসন ব্যবস্থা অনুকরণীয় এক আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত বহুদিন ধরে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের বিকল্প হিসাবে 'রামরাজ্য'-এর কথা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তুলে ধরেন গান্ধীজি। *হিন্দ স্বরাজ* বইতে গান্ধিজী স্বাধীন ভারতের সমাজ-রাজনীতি কোন পথে প্রবাহিত হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন তার একটা রূপরেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সহজে বোঝানোর জন্য রামরাজ্যের কথা গান্ধিজীই নিয়ে আসেন। একটা কথা কিন্তু এখনই বলে নেওয়া ভালো। সেটা হল গান্ধিজীর রামচন্দ্র ও রামরাজ্যের ধারণা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম-নিরপেক্ষ।

কিন্তু আজকের ভারতে রামরাজ্যের ধারণা একান্তভাবে একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়কে সমাজ-রাজনীতির শীর্ষে স্থাপন করার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে রামরাজ্যের যে ধারণা এখন প্রচার করা হচ্ছে সেই ধারণা আসলে ঐ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মাথার ওপরে বসে থাকা উচ্চবর্ণের লোকেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করা। আর এটা করার জন্যে ধর্মের নামে 'রাম'কে জড়িয়ে দেওয়া। আরও যেটা করা হচ্ছে সেটা হল একটা 'মিথ'(অতিকথন)-কে ইতিহাস হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু কেমন এমন করা হচ্ছে সে প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা করলেই আমরা পেয়ে যাব। অনেক লড়াই করে তবেই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আজ কিছু কিছু সাংবিধানিক সমানাধিকার লাভ করেছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের নিপীড়িত মানুষদের সেই সাংবিধানিক অধিকার মেনে নিতে বা স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। তাদের কায়েমী স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখতে আর চিরস্থায়ী করতে

তাই আমদানি করতে হয়েছে ধর্মের নামে রামকে, রাম মন্দিরকে, রামরাজ্যের ধারণাকে।

যারা এই রামরাজ্যের ধারণাকে প্রচার করে চলেছে তাদের যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করুন এই রামরাজ্যের ধারণাকে একটু বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলতে। সেখানে কোনো জবাব পাবেন না। জিজ্ঞাসা করুন এই রামরাজ্যের কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি কীরকম হবে। কোনো সোজাসাপটা জবাব পাবেন না। যেমন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে অপহৃত কোনো মহিলাকে উদ্ধার করার পরে আইন-রক্ষকেরা কি তার অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করবে না ডাক্তারি পরীক্ষা, আপনি উত্তর পাবেন না। যুক্তি-তর্ক গুলিয়ে দিয়ে সামনে চলে আঙ্ধ সবে আস্থা বা বিশ্বাসের প্রশ্ন। রামচন্দ্র ও রামরাজ্যের ধারণা বাস্তব না কল্পনা তাতে কিছুই যায় আসে না যদি সেই চরিত্র ও ব্যবস্থাপনায় অনুকরণীয় ও গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তু থাকে। এবং এরকম কোনো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে কি না সেটা বুঝতে গেলে দরকার বিষয়টি নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর আলোচনা।

হিন্দু সমাজে এখনও, এমনকি এই বিংশ-একবিংশ শতকেও জাতিপ্রথা (Caste System) ব্যবহার করে সমাজের এক ব্যাপক অংশকে দাবিয়ে রাখা হয়। এই জাতিভেদ প্রথা সমাজ থেকে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি বলেই আঙ্ধ মাদের সংবিধানের প্রধান স্থপতি ড. বি আর আম্বেদকর বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি *Riddle of Hinduism* শীর্ষক এক সমালোচনা মূলক রচনা লিখেছিলেন হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। সেই রচনাটি মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বি আর আম্বেদকরের নির্বাচিত রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে আছে। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান দুই চরিত্র রাম ও কৃষ্ণ প্রসঙ্গে আম্বেদকর কিছু সমালোচনা মূলক মন্তব্য এই রচনায় করেছেন। এই মন্তব্যগুলি ঐ রচনার পরিশিষ্টে আছে।

বর্তমান প্রবন্ধে রামের চরিত্র ও কার্যকলাপ বিষয়ে আম্বেদকরের বক্তব্য আমরা একটু বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করব।

বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণের কাহিনীতে রামের চরিত্র বা কার্যকলাপে আম্বেদকর এমন বিশেষ কিছু পাননি যাতে করে রামকে অনুকরণীয় বা খুব পূজনীয় এক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আম্বেদকরের মনে প্রশ্ন ওঠে যে রামের মধ্যে বিশেষ কিছু দেখতে পেয়েছিলেন বলেই না বাল্মীকি রামকে কেন্দ্র করে রামায়ণ রচনা করেছিলেন! এ প্রসঙ্গে বাল্মীকি নারদ মুনিকে ''হে

নারদ! আপনি আমায় বলুন বর্তমান সময়ে বিশ্বে সবচেয়ে সফল ব্যক্তিটি কে?'' বলে যে প্রশ্নটি করেছিলেন, আম্বেদকর সেই প্রশ্নটি সামনে এনেছেন। স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হল 'সবচেয়ে সফল ব্যক্তি' বলতে বাল্মীকি কী বোঝাতে চাইছেন? নারদ মুনির কাছে বাল্মীকি 'সবচেয়ে সফল ব্যক্তি'র যে সংজ্ঞা দিলেন সেই সংজ্ঞা অনুসারে সফল ব্যক্তি তিনিই যিনি ক্ষমতার অধিকারী, ধর্মের রহস্য বুঝতে সক্ষম, কৃতজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় সেটা জানেন, সত্যনিষ্ঠ, ধর্মীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে বিপদের মুখেও নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দিতে প্রস্তুত, নিজ চরিত্র সদগুণান্বিত, সমষ্টিস্বার্থ রক্ষায় তৎপর, শক্তিশালী, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শক্তির অধিকারী অথচ তাঁকে দেখলে প্রীতির সঞ্চার হয়, যিনি ক্রোধকে দমন করতে সক্ষম, বিশ্রুতকীর্তি, অন্যের শ্রীবৃদ্ধিতে যিনি ঈর্ষাপরায়ণ হন না, আর যুদ্ধের সময় ভগবানের হৃদয়কেও ভীতিগ্রস্ত করতে যিনি সক্ষম। বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য নারদ সময় চেয়ে নেন। অনেক বিচার-বিবেচনার পরে তিনি জানান যে দশরথপুত্র রাম-ই একমাত্র ব্যক্তি যার মধ্যে এই সব গুণ বিদ্যমান। রামের এইসব গুণের জন্যই তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। আম্বেদকরের প্রশ্ন, রাম কি সত্যই এমন এক ব্যক্তিত্ব যার ওপর দেবত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত?

আম্বেদকর তাঁর লেখায় রামের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে রাজ্যশাসন অবধি নানা বিষয় উল্লেখ করে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সেগুলি এখন ক্রমে ক্রমে পর্যালোচনা করে দেখব। রামের জন্মের সঙ্গে যুক্ত বাল্মীকি রামায়ণের দুটি ঘটনার উল্লেখ আম্বেদকর করেছেন। প্রথমটি দশরথপুত্র হিসাবে রামের জন্ম আর দ্বিতীয়টি রামের সহযোগী বানরদের জন্ম।

আম্বেদকর বলছেন যে রামের জন্মগ্রহণ এক অলৌকিক ঘটনা। ঋষি শৃঙ্গ যে 'পিণ্ড' প্রস্তুত করেছিলেন সেই পিণ্ড খাবার ফলেই কৌশল্যার গর্ভধারণ আর রামের জন্ম, এটা আসলে এক রূপক কাহিনী মাত্র। পরস্পরের মধ্যে 'স্বামী-স্ত্রী' সম্পর্ক না থাকলেও ঋষি শৃঙ্গের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে যে রামের জন্ম এই আসল সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্যই এই রূপকটি রচনা করা হয়েছে। যাই হোক না কেন, রামের জন্ম অশোভন বা কলঙ্কজনক না হলেও অস্বাভাবিক তো বটেই; এমনটাই মনে করেন আম্বেদকর। আমরা বাংলায় বলি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় যে 'পায়স' বা 'চরু' (দুধ-আতপ

চাল যজ্ঞের আগুনে ফুটিয়ে তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে) তৈরি করেন সেই চরু খেয়ে দশরথের তিন স্ত্রী গর্ভধারণ করেন। রামের জন্মের সঙ্গে আরও অনেক ব্যক্তি জড়িত আছে যাদের অপ্রীতিকর চরিত্র অস্বীকার বেশ দুরূহ বলে আঙ্গ স্বেদকরের ধারণা।

বানরদের জন্ম বিষয়ক কাহিনীটি এরকম। যে বিষয়কে সামনে রেখে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা শুরু করছেন সেটি হচ্ছে এই যে রাম ভগবান বিষ্ণুর অবতার। আর বিষ্ণু নিজেই সম্মত হয়েছিলেন দশরথপুত্র রাম হিসাবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে। ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণুর এই ইচ্ছেটি জানতে পারেন। ব্রহ্মা মনে করেন যে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রামকে যদি সফল হতে হয় তাহলে রামের জন্য শক্তিশালী এমন অনেক সহায়ক থাকতে হবে যারা রামের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কিন্তু তখন অবধি এমন কেউ ছিল না। বিষ্ণুর এই ইচ্ছাকে সফল করবেন বলে দেবতারা ব্রহ্মাকে জানালেন। দেবতারা সদলবলে স্বতঃপ্রবৃত্ত যৌনমিলন শুরু করে দিলেন, শুধু যার দেহোপজীবিনী ছিলেন সেই অপ্সরাদের সঙ্গে বা অবিবাহিত যক্ষ এবং নাগা কন্যাদের সঙ্গেই নয় বরং রুক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, কিন্নর ও বানরদের আইনানুসারে বিবাহিত পত্নীদের সঙ্গেও। পরবর্তীকালে রামের সহযোগী হয়েছিল যে বানরেরা তারা এভাবেই জন্মগ্রহণ করেছিল।

ভারতের সংবিধান কতটা আম্বেদকরের সংবিধান?

হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী

ডা. ভীমরাও আম্বেদকরের সম্মানে ভারতের সংসদ প্রাঙ্গনে তাঁর ৩.৬৬ মিটার উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি করেন বি.ভি.ওয়াগ। ২ এপ্রিল, ১৯৬৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। মূর্তির ডান হাতের তর্জনী সংসদের দিকে প্রসারিত। বাম হাতে ধরা ভারতের সংবিধান। বহু বিতর্ক ও সংশোধনের ২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ এই সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। আর ২০১৫ সালে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন করা শুরু করলেন। ফলে সবার মনে কেমন করে এই ধারণা বসে গেছে যে আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের একমাত্র রচয়িতা। অথচ সংবিধান ছাড়াও দলিত মুক্তি আন্দোলনে তাঁর বৃহত্তর কর্মযজ্ঞ আছে। তাঁকে সংবিধানের জনক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবিধান লাগু হওয়ার ৩ বছর পরে তিনিই রাজ্যসভায় বলেছেন, আমার বন্ধুরা বলে আমি সংবিধান তৈরি করেছি। কিন্তু আজ আমি সম্পূর্ণভাবে বলতে প্রস্তুত, এই সংবিধানকে পুড়িয়ে ফেলতে আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি। আমি এটা চাই না। এটা কাউকে মানায় না। (My friends tell me that I have made the constitution. But I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out.) তিনি আবার বলেছেন যে, আমি ছিলাম একজন ভাড়াটে লেখক, আমাকে যা লিখতে বলা হয়েছিল আমি তাই লিখেছিলাম (I was a hack. What I was asked to do I did much against my will)। আম্বেদকরের মতো লোকের মুখে এই ধরনের কথা বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু আমরা যদি ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ের ঘটনাগুলো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে এর উত্তর খুঁজে পাব। তিনি ক্যাবিনেট মিশনের কাছে দরবার করতে গেছেন যে শূদ্ররা হিন্দু নয়, এই তত্ত্ব স্বীকার করলে দ্বিজাতি তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। তাই গান্ধির কথায় মন্ত্রী পরিষদ আম্বেদকরের অনুরোধ খারিজ করে দেয়। আম্বেদকর গণপরিষদ গঠনের পক্ষেই ছিলেন না। প্যাটেল আম্বেদকরকে গণপরিষদে ঢোকা আটকাতে সবরকমের

চেষ্টা চালালেন। যখন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠাবার জন্য ব্যবস্থা শুরু করেছেন তখন প্যাটেল কিরণ শঙ্কর রায়কে লাগালেন আম্বেদকরের জেতা বানচাল করতে। যখন তাও পারলেন না তখন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা খুলনা ও বরিশাল, যেখানকার সদস্যরা আম্বেদকরকে ভোট দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। যাতে আম্বেদকর গণপরিষদে থাকতে না পারেন। কিন্তু আম্বেদকরের প্রতিভা ও ক্ষমতা তখন প্রতিষ্ঠিত। আবার আম্বেদকর ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটা খসড়া সংবিধান জমা দিয়েছেন সেটাকে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান বলা যায়। অবশ্য কংগ্রেসের একটা সংবিধান ছিল যেটাকে নেহরুর সংবিধান বলা হতো। ১৯৩০ সালে ২৬ জানুয়ারি যেটা কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাকে তুলে রেখেছিল। সেই সংবিধানকে সুভাষ লাগু করতে চেয়েছিলেন, ফলে তাঁকে কংগ্রেস পার্টি ছাড়তে হয়েছিল। সেই সংবিধানকে লাগু করতে গেলে নেহরুর অবস্থা সুভাষের মত হতে পারে তাই তাঁদের দরকার ছিল একজন লোক যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এসেছে। কিন্তু গণপরিষদে যে অস্পৃশ্য সদস্য রয়েছে তারা গান্ধিভক্ত। অস্পৃশ্যদের জন্য লড়াইয়ের শেষ রণভূমি গণপরিষদ। সেখানে ঢুকে অস্পৃশ্যদের/সংখ্যালঘুদের দাবি আদায় করতে হবে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আম্বেদকর গণপরিষদে ঢুকলেন, আইনমন্ত্রী হলেন এবং সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি হলেন। এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে সেই পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

ব্রিটিশ আগমনের আগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও হিন্দু রাজারা অস্পৃশ্যতাকে শূদ্রদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তারা ভেবেছিল এর থেকে তাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সৈনিকদের দরকার হয়েছিল এবং প্রথমে অস্পৃশ্য ছাড়া আর কেউই কোম্পানির সৈন্যদলেযোগ দেয়নি। সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ পেল। এর ফলে তারা বুঝতে পারল ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই তাদের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছে। তারা মুক্তি লাভের জন্য সচেষ্ট হলো। তারা সামাজিক সমতা বা সম অধিকার লাভের জন্য কিছু পরিকল্পনা নিল। কিছু কিছু হিন্দুরাও এই ত্রুটি দূর করার জন্য সচেষ্ট হলো। রামমোহন রায় প্রথম এই কাজ শুরু করেন। রাজনৈতিক সংস্কারের আগে সামাজিক সংস্কারের কাজ শুরু হল। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতায় সেই সংস্কার বন্ধ হয়ে গেল। তখন অস্পৃশরা রাজনৈতিক রক্ষাকবচের মধ্যে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হলো।

অনেক হিন্দু যুক্তি দেখান যে হিন্দু ধর্ম এমন একটা পরিবর্তনযোগ্য ধর্ম যাতে

সবকিছুই গ্রহণযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এর একটা বড় উদাহরণ হলো সম্রাট আকবরের সময় হিন্দুরা 'আল্লা-উপনিষদ' তৈরি করেছিল এবং আকবরের দীন-ই-ইলাহি ধর্মকে হিন্দু ধর্মের ৭ম দর্শন বলে গ্রহণ করেছিল। গোমাংস ভক্ষণকারী হিন্দুধর্ম যার প্রকৃত নাম ব্রাহ্মণ্যবাদ তা একদিন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে নিরামিষভোজী ধর্মে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এটাও সত্য যে হিন্দু ধর্ম কখনও অস্পৃশ্যদের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেনি।

গান্ধিজীর জন্মের অনেক আগে থেকে অনেক সংস্কারক ভারতে এসেছেন এবং তাঁরা অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। অস্পৃশ্যরা ছিল হিন্দুদের বেতনবিহীন হুকুমের চাকর। হিন্দু সমাজের যাবতীয় নোংরা কাজকর্ম করতে তারা বাধ্য ছিল। আম্বেদকরের কাছে ব্রিটিশরাজের থেকে হিন্দুরাজ ছল ভয়াবহ। তাঁর মতে, 'স্বরাজ হিন্দুদের হাতে আরো বেশি ক্ষমতা দেবে এবং অস্পৃশ্যদের আরো বেশি অসহায় করবে'। তাই আম্বেদকরের কাছে হিন্দুত্ব ছিল সবচেয়ে বড় পরাধীনতার কারণ। প্রশ্ন ওঠে অস্পৃশ্যরা কি হিন্দু ছিল না? আম্বেদকর বলছেন, 'না, অস্পৃশ্যরা হিন্দু ছিল না'।

তবে গান্ধি যে এত আন্দোলন করলেন, সেটা কি মিথ্যা না লোক দেখানো? কংগ্রেস ও গান্ধি অস্পৃশ্যদের জন্য কী করেছে প্রবন্ধে আম্বেদকর লিখছেন— ''লুই ফিসারের গান্ধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে লুই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি শুনেছি যে কংগ্রেসকে চালাচ্ছে কিছু বড় বড় শিল্পপতি এবং গান্ধিজীর পিছনে টাকা ঢালছেন বোম্বাইয়ের কোটিপতিরা'। গান্ধি এই কথা স্বীকার করেন। আম্বেদকর মন্তব্য করেন:- আজ ভারতের রাজনীতির যৌথশক্তি 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় চক্র' নয়, 'ব্রাহ্মণ-বনিয়া চক্র'। ১৯১৮ সালে যখন অব্রাহ্মণ ও নির্যাতিত শ্রেণির মানুষরা আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব লাভের জন্য আন্দোলন শুরু করেন তখন তিলক বলেছিলেন— 'তেলি, তামাকওয়ালা, ধোবা প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণির লোকেরা আইনসভায় যেতে চায় কেন? তাদের কর্তব্য হলো আইন মেনে চলা, আইন তৈরি নয়'। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসিরা আইনসভা বয়কট করলে প্রচার শুরু করে, 'আইনসভায় যাবে কারা? নাপিত, কুমোর, মুচি, মেথর'? শুধু তাই নয়, কংগ্রেসিরা ভাবল কোনো উচ্চবর্ণের হিন্দু আইনসভায় মুচি মেথরের পাশে বসতে রাজি হবে না। এটাই হলো শূদ্র শ্রেণির জনগণের প্রতি ভারতের শাসক শ্রেণির আসল মনোভাব''।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পটভূমি:

১৯৩৯ সালে লিনলিথগো ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধের পর ভারতীয়দের সাথে বসে একটা সমাধানের পথ খুঁজবেন। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদ গঠন করে গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে এক সংবিধান রচনার দাবি করে। অক্টোবর ১৯৪৩, ওয়াভেল লিনলিথগোর জায়গায় বড়লাট হন। যুদ্ধ শেষ হলে লেবার পার্টি ইংল্যান্ডে ক্ষমতায় আসে। ক্লিমেন্ট এ্যাটলি প্রধানমন্ত্রী হয়ে পেথিক লরেন্স, স্টাফোর্ড ক্রিপস্ ও এ.বি. আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত রক মন্ত্রী পরিষদ (ক্যাবিনেট মিশন) ভারতে পাঠান। মিশন প্রস্তাব করে—

১. প্রত্যের রাজ্যে দশ লাখ লোক প্রতি একটি রাজ্যসভার আসন;

২. রাজ্যের আসনে মুসলিম ও শিখদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন হবে। বাকি আসন সাধারণ;

৩. দেশিয় রাজাদের ৯৩ জন প্রতিনিধি থাকবে।

৪. গণপরিষদে ২৯৩ জন সদস্য থাকবে। তারা ব্রিটিশের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করবে।

মন্ত্রী মিশনের ঘোষণায় তফসিলী জাতি বা তাদের রক্ষাকবচ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯৪২ সালে গঠিত হয়েছিল তফসিল ফেডারেশন। ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠন করতে হবে। গণপরিষদ গঠনের জন্য রাজ্যে নির্বাচন। কংগ্রেসের নেতা প্যাটেল সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন ফেডারেশন যেন ভোটে জিততে না পারে। গণপরিষদ গঠনের জন্য ১ ৯৪৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সারা ভারতে মাত্র একজন তফসিল ফেডারেশনের প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন— তিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। আম্বেদকর এই নির্বাচনে হেরে গেছিলেন। ফলে তার গুরুত্ব কমে যায়। তবু তিনি ও তারা সিং সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে মিশনের সাথে দেখা করে অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভায় ও মন্ত্রী পরিষদে তাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তার দাবি করেন (সুকৃতি বিশ্বাস/আম্বেদকর/পৃ ১৬৯)। আম্বেদকর চিঠি লিখে স্পষ্টীকরণ চাইলেন। আলেকজান্ডার জানালেন, তফসিল জাতি সংখ্যালঘুদের মধ্যে পড়বে। কিন্তু গান্ধি তখন আবুল কালাম আজাদকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে মিশনকে জানালেন যে, তফসিলরা হিন্দু সমাজের একটা অংশ, এরা সংখ্যালঘুদের মধ্যে পড়ে না (সদানন্দ বিশ্বাস/যোগেন্দ্রনাথ/৫৩)। ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের জুন মাসে ইংল্যান্ড যাত্রা করে। মন্ত্রী মিশন তফসিলী জাতির যে

সর্বনাশ করেছে তার প্রতিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিলেতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে আম্বেদকর ১৫ অক্টোবর তারিখে করাচি থেকে লন্ডন রওনা হন (সদানন্দ বিশ্বাস/যোগেন্দ্রনাথ/৪৭)।

ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী গণপরিষদ গঠনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সারা ভারতে যোগেন্দ্র মণ্ডল ছাড়া এসেমব্লিতে আম্বেদরকরের নাম প্রস্তাব করার কেউ ছিল না। বাংলায় তফসিলদের ৩০টা আসনের মধ্যে ২৬ জন জিতেছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে। আম্বেদকরকে আটকানোর জন্য কংগ্রেস মতুয়া নেতা পি.আর.ঠাকুরকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই অবস্থায় যোগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার অস্পৃশ্য সমাজ নির্দল সদস্য ও অস্পৃশ্য কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বাড়িতে গিয়ে আম্বেদকরকে ভোট দিতে অনুরোধ করেন। তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ছাড়া কংগ্রেস সদস্যগণ দ্বারিকানাথা বারুরী (ফরিদপুর), গয়ানাথ বিশ্বাস (কুমিল্লা), ক্ষেত্রনাথ সিংহ (রংপুর), ও নির্দল সদস্য নগেন্দ্রনাথ রায়(রংপুর) ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক(খুলনা) আর বীর বিরসা(আদিবাসী) (সুকৃতি বিশ্বাস/আম্বেদকর/১৬৯)।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সম্পর্কে আম্বেদকরের ভাবনা

আম্বেদকর আইনবিদ, আইনি পথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। নতুন ভারতের নতুন সংবিধান লেখা হবে, সেখানে না থাকলে তো হিন্দুরা নিজেদের খুশিমতো সংবিধান লিখবে। আম্বেদকর গণপরিষদে প্রবেশ করলেন। যে গণপরিষদের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি লিখছেন, 'আমি সম্পূর্ণভাবে গণপরিষদের বিরোধী। ইহা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। ভারতে ১৯৩৫ সালের সংবিধানে ইতিপূর্বে যা লেখা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আঙ্গ লোচনা সময়ের অপব্যয়। তবে একটা কাজ গণপরিষদকে দেওয়া যেতে পারে। আর তা হল ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান খোঁজা। আম্বেদকর বলছেন:- 'ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা হয়েছে এইভাবে— যখনই একটা সম্প্রদায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা দাবি করে, তখন তার সদিচ্ছা আদায়ের জন্য তাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। তার দাবির কোনো আইনানুগ পরীক্ষা সেখানে নেই। পরিণাম হলো যে এই দাবির সীমাও নেই আর সুযোগ দানেরও কোনো সীমা নেই। যেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, সামাজিক দিক থেকে মর্যাদাহীন, শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা শোষিত, উৎপীড়িত, নির্যাতিত, সমাজ কর্তৃক

পরিত্যক্ত, সরকার দ্বারা অস্বীকৃত, যাদের আশ্রয়ের কোনো নিরাপত্তা নেই, ন্যায় বিচারের সমান সুযোগ ও ন্যায্য ব্যবহারের কোনো নিশ্চয়তা নেই''। এই সমস্যা সমাধানের তিনটি উপায়

১. আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব অর্জন

২. শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অংশগ্রহণ

৩. চাকুরিতে সংরক্ষণ।

এই উপায় অর্জনের জন্যই আম্বেদকরের গণপরিষদে অংশগ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছিল ।

আম্বেদকর গণপরিষদে যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং সংখ্যালঘুদের উপর যে পুস্তিকা প্রচার করেছেন তাতে গণপরিষদের সদস্যরা বুঝতে পেরেছিলেন সংবিধান রচনায় আম্বেদকরের উপস্থিতি অপরিহার্য। তাছাড়া অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সারভেন্ট সংবিধানের উপদেষ্টা বেনেগাল নরসিংহ রাও তার '*কনস্টিটিউশন ইন মেকিং* গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি সংবিধান নিয়ে আলোচনার জন্য তৎকালীন পৃথিবী বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত প্র. জেনিংস-এর সাথে দেখা করেন তখন তিনি হেসে উত্তর করেছিলেন, তোমাদের দেশের এমন একজন আছে যাকে আমরা মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করি। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন প্রতিভা, পৃথিবীর সব দেশের সংবিধান তাঁর করায়ত্ত্ব, তার নাম ভীমরাও আম্বেদকর।

এই কথা শুনে রাও দেশে ফিরে গণপরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ আম্বেদকরের ভাষণ আগেও শুনেছেন। এদিকে বাংলা ভাগের ফলে যশোর ও খুলনা পূর্ব পাকিস্থানে পড়ে। এই দুই জেলার সদস্য দ্বারা আম্বেদকর গণপরিষদের নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই দুটি জেলা পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ায় আম্বেদকর গণপরিষদের সদস্য রইলেন না। তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদ বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী বি.জি. খেরে কে ৩০ জুন এক চিঠি লিখে আম্বেদকরকে জিতিয়ে গণপরিষদে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলেন। মুকুন্দরাও জয়কার পদত্যাগ করেন, তার জায়গায় আম্বেদকর নির্বাচিত হয়ে গণপরিষদে যোগদান করেন। ১৫ আগস্ট নেহেরুর অনুরোধে আম্বেদকর আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট আম্বেদকর খসড়া সংবিধান কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

আম্বেদকর একজন প্রতিবাদী হিসাবে গণপরিষদে যোগ দিয়েছিলেন। তফসীলিদের স্বার্থরক্ষার জন্যেই তিনি আইনসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কখনোই ভাবেননি যে তিনি ভারতের সংবিধানের মূল স্থপতি হবেন।

নেহেরু যে সংবিধান তৈরি করেছিলেন সেটা ছিল লোক দেখানো। আম্বেদকর নিজেও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটা খসড়া সংবিধান গণপরিষদের কাছে দিয়েছিলেন। সোসালিস্ট পার্টিও এরকম একটা সংবিধান দিয়েছিল। কিন্তু যখন সত্যি সংবিধান রচনার ভার তার কাঁধে এসে পড়ল তখন সংবিধান সম্পর্কে আম্বেদকর বলছেন—'ভারতের অতীত সংবিধান ভারতকে স্বশাসিত দেশ হিসাবে গণ্য করেনি। ভবিষ্যৎ সংবিধান এই ধারণা নিয়ে এগোবে যে ভারত হবে একটি স্বশাসিত দেশ। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে সংবিধান এমনভাবে তৈরি করা উচিত যা কেবলমাত্র আনুগত্যকেই বাধ্যতামূলক করবে তাই নয় সবার শ্রদ্ধাও আয়ত্বে রাখবে এবং সমস্ত বা যদি সমস্তও না হয়, অন্তত ভারতের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একে গ্রহণ করবে এবং তাদের সমর্থন দিতে প্রস্তুত থাকবে। আম্বেদকর প্রস্তাব করেছিলেন যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে বৈধ ও অবৈধ সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। সমান শিক্ষার অধিকার সমস্ত নাগরিকের সামনে খোলা থাকবে। প্যাটেল আপত্তি করেন এই বলে যে, বোম্বাইয়ের কলেজে বাইরের ছাত্র পড়তে আসলে বোম্বাই কেন তাদের খরচা বইবে? প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তিনি বৃহৎ শিল্প, বীমা কোম্পানি, কৃষিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন, সেটাও আনতে পারলেন না। আম্বেদকরের পছন্দ ছিল আমেরিকার সংবিধান। তাঁর মতে ব্রিটিশ ধাঁচের সংবিধান সংখ্যালঘুদের জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

শুরুতে গণপরিষদ স্বতন্ত্র নির্বাচনবিধি বাতিল করে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পর এই সুযোগ বাতিল করার প্রস্তাব আসে। তখন তফসিলদের প্রস্তাব করে যে যেহেতু তারা পিছিয়ে আছে সেই হেতু তাদের উন্নতির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হোক। তাই প্রস্তাব সংশোধিত করে লেখা হয় 'তফসিল জাতি ছাড়া সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাতিল করা হলো।' কিন্তু আম্বেদকরের সব থেকে বড় কৃতিত্ব যে তিনি তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের সুরক্ষার জন্য সংবিধানের পার্ট ৩ ও পার্ট ১১ ও সিড্যুল ৫ ও এরপর বড় বিষয় অস্পৃশ্যতা বিলোপ। আর্টিকেল ১৭ সব ধরনের অস্পৃশ্যতার বিলোপ ঘটায়। এই ধারা অনুসরণ করে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন ১৯৫৫ পাশ হয়। আম্বেদকরের ভাষায় এটা ভাগ্যের পরিহাস যে লোকটা একটা স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়েছে, যাকে শ্রেণি কক্ষের বাইরে বসে পড়তে হয়েছিল, তার উপরে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হয়েছে এবং

সেই পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা প্রথা, নিজেই যৌবনকালে যার শিকার হয়েছিলেন, তার উপর মরণ আঘাত হেনেছেন। (গণপরিষদের ভাষণ, ভল্যুম-৩, পৃ-৪৩৭)।

গণপরিষদের সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেন, আমরা কেবলমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট হবো না। সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র টেকে না। সামাজিক গণতন্ত্র বলতে একটা জীবনধারাকে বোঝায় যা স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে জীবনের নীতি হিসাবে স্বীকৃতি জানায়।

এ ভূখণ্ডে জাত-শ্রেণি সম্পর্ক

অনন্ত আচার্য

প্রলেতারীয় বিপ্লব, উনিশ শতকের বিপ্লব গুলির মতো অবিরাম আত্মসমালোচনা করে চলে, আপন গতিপথে বারবার থমকে দাঁড়ায়, সমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করার জন্য ফিরে আসে, নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, অকিঞ্চিতকরতাকে উপহাস করে নির্মম গভীরতায়, শত্রুকে ধরাশায়ী করে যেন এই উদ্দেশ্যে সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সঞ্চার করে প্রবলতর রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে। আপন লক্ষ্যের অনির্দিষ্ট বিশালতায় নিজেরাই যেন বারবার পিছিয়ে আসে যতক্ষণ না এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যার থেকে কোনো পশ্চাদমুখী যাত্রা অসম্ভব এবং যে পরিস্থিতি যেন চিৎকার করে ডাক দেয়: এইতো রাস্তা -- এখানেই নৃত্য করো। (লুই বোনাপার্ট-এর এইট্টিন্থ ব্রুমেয়ার—পৃ. ২৪৪— রচনা সংকলন—মার্কস এঙ্গেলস্—প্রথম খণ্ড—প্রথম অংশ—(মস্কো-সংস্করণ)

কয়েকটি তথ্য প্রদান করলেই প্রবন্ধটি সহজবোধ্য হবে।

ক) যে ৮২টি শিল্পপতি পরিবারের ভারতের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাদের মধ্যে টাটাকে বাদ দিলে বাকিরা উচ্চবর্ণ হিন্দু। তথ্যসূত্রের প্রয়োজন আছে কি?

খ) আর টি আই প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে নজরে পড়ার মতো টাকা যারা আয়কর হিসেবে দিয়েছে তাদের তালিকায় ১০৪তম (মুদ্রা মূল্য হিসেবে) ব্যক্তি একজন মুসলমান। ১২২ এবং ১২৩ তম ব্যক্তিরা যথাক্রমে ও বি সি এবং এস সি। প্রথম ৫০০ জনের মধ্যে এস টি (ট্রাইবাল)দের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

গ) ডাফোড্রাম ও কে এম ডি এ (তৎকালে সি এম ডি এ)-র যৌথ উদ্যোগে কলকাতার ১০ হাজার ফুটপাথ বাসিন্দার তথ্য অনুসন্ধান করে যা ২০০৪ সালে কে এম ডি এ-র বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। মনমোহন চক্রবর্তী নামে একজন মাত্র ব্রাহ্মণকে পার্ক সার্কাসের ৪ নম্বর পুল-র পাশে পাওয়া যায়। যিনি মানসিক ভারসাম্যহীন এবং ৪/৮৭ নেতাজী পার্ক, টালিগঞ্জের আসল বাসিন্দা। তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যরা সেখানে স্বচ্ছন্দেই বাসবাস করেন। কিন্তু বাকি ফুটপাথ বাসিন্দারা এস সি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যাঁরা খোলা আকাশের নীচে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, মল-মূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এনারা এক অন্য কলকাতার বাসিন্দা।

ঘ) শিবপুর, হাওড়া থেকে প্রকাশিত নব উদ্যোগ পত্রিকার ফেব্রুয়ারী-২০০৫ এ প্রকাশিত সংখ্যায় বিল্বদল চক্রবর্তী কলকাতার ভিখারীদের বিষয়ে একটি সমীক্ষাভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের শেষাংশে (৩৫ পৃ) শ্রীমুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকরা অন্য ভিক্ষুকদের তুলনায় দ্বিগুণ বা তার বেশি উপার্জন করেন।

ঙ) ডাফোড্রাম কলকাতার শিশু শ্রমিকদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। চা-এর দোকান, ভাতের হোটেল, মোটর গ্যারেজ, রুটি বিস্কুটের কারখানায় দিনে ১৪-১৬ ঘন্টা কাজ করে যাদের বেশীরভাগ এস সি, মুসলমান ও ওবিসি সম্প্রদায় (উন্নয়ন বার্তা, মে ১৯৯৯)।

চ) সর্বশিক্ষা অভিযানের মে ২০১১-র রিপোর্টে মাস-এডুকেশন বিভাগ জানাচ্ছে যে বিদ্যালয়ছুট ছাত্রদের প্রায় সবাই দলিত, আদিবাসী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

ছ) দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভার বিপিএল তালিকাভুক্ত রেশন কার্ড-এর মালিকদের ৩০,০০০ জনের মধ্যে ৩২টি পরিবার বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ডাফোড্রাম-এর এই সমীক্ষা দেশকাল পত্রিকায় জুন ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়।

জ) ফিক্সড ইনকাম গ্রুপ-এর ৬৫ শতাংশ বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। (C.A.G. Report 2014)

সুকোমল সেন-এর মতে **ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা বর্ষ** ১৮৩০ সাল (*ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*– সুকোমল সেন– প্রকাশ– এন বি

এ ২০১৫)। পক্ষে বিপক্ষে মত দেওয়া যেতে পারে। এই সালের আগের খনিজ শিল্প (লোহা, কয়লা ইত্যাদি), চটকল, পাটকল, সুতাকল সহ বহুশিল্পের পত্তন হয় যেখানে যুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। শিল্প-শ্রমিক, মজুরি দাসত্ব, অবৈধ মুনাফা ছিল ফলে শ্রমিকদের ক্ষোভ আন্দোলন ছিল না– এই সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় সঠিক নয়। নথিভুক্ত না হলে তা ইতিহাস নয়– এ দ্বন্দ্বে স্বয়ং কার্ল মার্কসকেও পড়তে হয়েছিল। পড়ে এঙ্গেলস্ পাদটীকা (ফুটনোট) দিয়ে সামাল দেন। আলোচিত শতাব্দীতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য সারা পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্যারি কমিউন, আমেরিকার হে মার্কেটে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে সংগ্রামরত শ্রমিকদের আত্মত্যাগ, সর্বোপরি *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* প্রকাশ। এসব খবর ভারতে একেবারেই আসেনি তা তো নয়। বৃটিশ নাবিকরা গোপনে এদেশে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে এসেছিলেন তাও জানা যায়। যদিও তার প্রভাব ভারতে শ্রমজীবী মহলে পড়েছিল এমন কোনো ঘটনা জানা নেই। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার (মডার্ন টাইমস-১৮৮০ -১৯৫০-পার্মানেন্ট ব্লাক- ২০১৫) লিখেছেন– শশিপদ ব্যানার্জী ১৮৬৬-৭৫ পর্বে বরানগর পাটকলগুলিতে শ্রমিক কল্যাণে কাজ করেছিলেন। নৈশ বিদ্যালয়, শ্রমিক ক্লাব, সঞ্চয় ব্যাঙ্ক স্থাপন তাঁর কর্মসূচিতে ছিল। ভারত শ্রমজীবী নামে একটা কাগজও বের করতেন। সুমিত সরকার-এর দীর্ঘ লেখার নির্যাস– শশিপদ বানার্জী নেহাতই সংস্কারবাদী ছিলেন। পত্রিকার মাধ্যমে শ্রমিকদের উপদেশ দিতেন:- তোমরা মদ্যপান করিও না, বই-পুস্তক পড়ো, পরিবারের জন্য অর্থ সঞ্চয় করো ইত্যাদি ইত্যাদি। চটকলের ব্রিটিশ মালিকরা এসব অপছন্দ করতো না বরং উৎসাহ দিত। শশিপদ ব্যানার্জী-এর সমসাময়িক আর একজন শ্রমিক নেতার সম্বন্ধে বাংলার প্রগতিশীল সমাজ জানতে চান না, তিনি হলেন নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডে (১৮৪৮-৯৭)। লোখাণ্ডে সম্পর্কে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সুশান্ত সরকার লিখেছেন (চেতনা লহর-জুলাই-১৫ বর্ষ-৫):- লোখাণ্ডে পূর্বতন বোম্বাই শহরের সুতাকলে গেটকিপারের কাজ করতেন। তিনি জন্মসূত্রে ফুলমালী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং জ্যোতিবা ফুলে প্রতিষ্ঠিত সত্যসাধক দলের নেতা ছিলেন। এর ফলে তিনি শ্রেণি শোষণ এবং জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন। ১৮৮৪ সালে বোম্বাই মিলহ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন, তিনি দীনবন্ধু নামে মারাঠী ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। দলিত শ্রমজীবীদের মধ্যে এই পত্রিকা বেশ সাড়া ফেলে। জ্যোতিবা ফুলে-এর কাছ থেকে পাওয়া এই *এইজ অফ রিজন* (লেখক– পেইন)

বইটি পড়ে দীনবন্ধু পত্রিকায় কুসংস্কার বিরোধী লেখা শুরু করেন। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার অবশ্য লোখাণ্ডে সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল মতামত জানিয়েছেন-- ''**কুনবি ও মাহার জাতের লোকজন যারা ফুলে-এর আন্দোলনের মূল বনেদ হিসেবে কাজ করেছিল তারা কিন্তু বম্বে মিল-শ্রমিকদের মধ্যে বেশ শক্তি অর্জন করেছিল। লোখাণ্ডে যে এদের নিয়ে এত আগ্রহ বোধ করেছিলেন তার কারণ একটাই-- তিনি অব্রাহ্মণ খেটেখাওয়া মানুষদের এক ধরনের প্রশস্ত মঞ্চে টেনে আনার চেষ্টা করেছিলেন।**'' বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আশীষ লাহিড়ী অবশ্য সুমিত সরকার-এর মতোই লোখাণ্ডেকে কয়েক পা এগিয়ে রেখেছেন। আশীষ লিখেছেন-- ''**আমরা বলতে পারি, উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী যে ধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল শশিপদ যদিও তার সাথে যুক্ত হননি কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগরিত নিরিখে তিনি ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতা কাটতে পারেননি। তাই শ্রমিকদরদী হয়েও শ্রমিক বন্ধু ও মালিক বন্ধুও থাকার চেষ্টা করেছিলেন, শ্রমিক-মালিক সমঝোতার পন্থা অবলম্বন করেছিলেন অথচ ওই একই পর্বে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা ফুলে-এর শিষ্য লোখাণ্ডে শ্রমিকদের নিজস্ব চাহিদাগুলিকে সংগঠিতরূপ দিচ্ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দলিতদের যে একটা বিশেষ স্থান আছে তা লোখাণ্ডে উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতাই ছিল তাঁর মতাদর্শগত খুঁটি।**''(চেতনা লহর-বর্ষ-৬-সংখ্যা-২০১৬)। জাত-শ্রেণির আন্দোলনের সম্পর্কে লোখাণ্ডে অনন্য। লোখাণ্ডে সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানা যায়-- লোখাণ্ডের লেখা *অন্য দুনিয়া* (মনোহর কদম-নিউক্যাম্প-২০০৩), নলিনী পণ্ডিত-ই পি ডব্লিউ ফেব্রুয়ারী ১৫-১৯৯৭, দীনবন্ধু পত্রিকার সম্পাদকীয় সংকলন-প্রশান্ত-নিউ ক্যাম্প-২০০৫। মোদ্দা কথা এই কার্ল মার্কস-এর কথায় যারা প্রলেতারিয়েত আম্বেদকরবাদীদের ভাষায় যারা দলিত ভারতের সমাজব্যবস্থায় তাদের সমস্যা নিয়ে সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা মানুষ লোখাণ্ডে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন আজ তার ১৫০ বছরের বেশি পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলনে সেই ভূমিকা পালনে চূড়ান্ত অনীহা দেখা যাচ্ছে। আনন্দ তেলতুম্বদে সঠিক ভাষায় লিখেছেন-- এখন 'লাল' বনাম 'নীল'-এর বিবাদের সময় নয়। (চেতনা লহর-জুলাই-বর্ষ-৬-অনুবাদ-উজ্জ্বল রায়)। তেলতুম্বদে-এর লেখা বই *ইন্ডিয়া এন্ড কমিউনিজম*-লেফটওয়ার্লড-১৭ পড়ে নিলে ভালো হয়।

কৃষক সংগ্রাম ও শ্রেণি বা কৌম্ ভাবনা

যে যে সংগ্রামগুলি সিধো, কানহু, বিরসা মুণ্ডা, তিলকা মাঝি, তিতুমীরদের নেতৃত্বে ঘটেছিল তা একইসাথে কৃষক শ্রেণির বিদ্রোহ ও কৌম্ বা সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই। দুই ভাবেই সংগ্রামগুলিকে আজ চিহ্নিত করা দরকার। সুপ্রকাশ রায় তাঁর গ্রন্থে (*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*- র‍্যাডিক্যাল-ইম্প্রেসন) এই সব বিদ্রোহকে শ্রেণিদৃষ্টিগত দেখবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অধ্যাপক রনজিত গুহর শ্রেণিকে কম গুরুত্ব দিয়ে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' চর্চা করেছিলেন। বলা দরকার উপরোক্ত দুই মহান গবেষকদের পরবর্তী প্রজন্মের 'ভাবশিষ্য'রা বিপজ্জনক পথে হাঁটছেন। আন্দোনিও গ্রামশি ইতালির ফ্যাসিস্টদের জেলখানায় বসে গোপনীয়তার কারণে তাঁর জেল ডাইরিতে সাবঅলটার্নস, মার্জিনস শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। তা যে পরবর্তীকালে জ্যাক দেরিদা-এর হাত বদলে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত কবিরাজদের হাতে এসে শ্রেণির রাজনীতির বিরুদ্ধে পরিচয়ের রাজনীতির অন্ধ গলিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তা কল্পনার বাইরে ছিল। মার্কসবাদ যে 'ডগমা নয়-গাইড টু অ্যাকশন' তা অবশ্য সুপ্রকাশ রায়ের আগের বা পরের প্রজন্মের অধিকাংশ মার্কসবাদীরা চিন্তায় আনেননি। ভারতের সমাজ চতুর্বর্ণ ব্যবস্থায় আক্রান্ত হবার ফলে দলিত দরিদ্র জনগণ প্রাথমিক স্তরের গণতন্ত্রের স্বাদ না পেলে ভারতে সমাজ বিপ্লবের 'ফ্লাড গেট' টাই খুলতে পারবেন না-- এটা মাথায় রাখা দরকার।

নকশালবাদী আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী খোকন মজুমদার (প্রকৃত নাম আব্দুল হামিদ) চেতনা লহর পত্রিকা (জুলাই-২০১৪ সংখ্যা) লিখেছিলেন-- 'জীবন বাজি রেখে যাঁরা তরাই ডুয়ার্স-এ শ্রমিক কৃষক বিদ্রোহে, যার মধ্যে তেভাগা আন্দোলনও পড়ে, শহিদ হয়েছেন তাঁদের নাম, পদবী, আর্থিক সামাজিক অবস্থান, পেশা জানলে জাত-জাতি শ্রেণি সম্পর্ক বোঝা যাবে--' ঐ প্রবন্ধে খোকন মজুমদার ১৯২জন সংগঠক শহীদদের নাম তালিকা প্রকাশ করেন যাঁরা আদিবাসী, রাজবংশী ও মুসলমান। এদের মধ্যে করমী ওরাঁও, বুধনী, ওরাঁও, স্বর্ণময়ী ওরাঁও, এতোয়ারী মুণ্ডা নামে মহিলাদের নাম পাওয়া যায়। মূলকথা এই যে মেহনতী দলিত দরিদ্র 'প্রান্তবাসী'র মেহনতের 'সারপ্লাস' চোর বুর্জোয়াদের উচ্ছিষ্টভোগী 'ভদ্দরলোক' মধ্যবিত্তের 'সুখী গৃহকোণ শোনে গ্রামাফোন' মার্কা জীবন। আর সেই আর্থিক সামাজিক বৈষম্যের শিকার মানুষজন যদি সমাজ বিপ্লবের আগে এবং অবশ্যই পরে দেশ ও সংগ্রাম পরিচালনার নীতি নির্ধারক সমিতিতে স্থান না পান তবে সেই বিপ্লবের পরাজয় নিশ্চিত। সম্ভবত এই

আশঙ্কায় লেনিন স্বয়ং লিখেছিলেন– ''**আজকের দিনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হল শ্রমিকদের এবং সাধারণভাবে সমস্ত মেহনতি ও শোষিত মানুষে স্বাধীন উদ্যোগের বিকাশ ঘটালো, সৃজনশীল সাংগঠনিক কাজে একে বিকশিত করা। শুধু তথাকথিত উচ্চশ্রেণির লোকেরাই ধনীদের শিক্ষায়তনে যারা পড়েছে তারাই শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাংগঠনিক বিকাশ পরিচালনা করতে পারবে এই অবাস্তব, বর্বর, ঘৃণ্য, বিশ্রী, কুসংস্কার আমাদের যে কোনো মূল্যে ভাঙতে হবে।**'' ভারতে এই 'ভদ্দরলোক' মধ্যবিত্ত কারা? লেনিন-এর শব্দবন্ধের নতুন মানুষ কোথায়? বর্তমানে রাজনৈতিক কাঠামো বাদ দিলেও বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোয় যারা নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে তারা প্রায় সকলেই বর্ণ হিন্দু। রাষ্ট্র তাদের করায়ত্ব করেছে ফলে তারা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত স্তরে পৌঁছে গেছে।

জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রীবাই ফুলে, পেরিয়ার, আম্বেদকর, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ কী চেয়েছিলেন? এনাদের কর্মজীবন কি সমতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় ছিল? গবেষক কণিষ্ক চৌধুরী অনীক পত্রিকার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সংখ্যায় ফুলে দম্পতি সম্পর্কে পৃ. ৯৫-১১০ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যা বাংলা ভাষায় উক্ত বিষয়ে সম্ভবত দীর্ঘতম প্রবন্ধ। ঐ রচনার তথ্যসূত্রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিথ কোনো বই-এর উল্লেখ নেই বললেই চলে। রনজিৎ শিকদার-এর উদ্যোগে আম্বেদকর প্রকাশনী, গড়িয়া, ফুলে দম্পতি সম্পর্কে দুটি চটি বই প্রকাশ করে যা প্রাথমিক পাঠ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বভারতীর মারাঠা সাহিত্য বিভাগের শিক্ষিকা বীণা আগাসে জ্যোতিবা ফুলে লিখিত *গুলাম গিরি*-র অনুবাদ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাংলার 'বিদ্বজন'-এর কাছে তখন গ্রহণযোগ্য হয়নি। এক সাক্ষাৎকারে বীণা আগাসে জানান:- গৌর দা (গৌরকিশোর ঘোষ)-এর কাছে বইটি নিয়ে যাবার পর উনি বলেন:- ''আমাদের বিদ্যাসাগরই যথেষ্ট। তোমার ঐ ফুলে টুলের দরকার নেই''। ফুলে দম্পতির বর্ণময় জীবনের নানা কাহিনী বাদ দিলেও তাঁদের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব দিতেই হয়। ১৮৮২ সালের ১৯ অক্টোবর বৃটিশ সরকারের কাছে তাদের (সত্যসাধক দল) দাবিপত্রে লিখিত হয় — ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজস্বের বেশিরভাগ প্রজাদের কঠোর শ্রম থেকে সংগৃহীত হয়, এই রাজস্বদানে ধনী শ্রেণির অবদান প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু এই রাজস্বের বেশিরভাগ অংশই উচ্চবর্ণের শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। সরকারের এই অনিরপেক্ষ দৃষ্টিগুলির বদল হওয়া দরকার। (*ফুলে-লেফট্ ওয়ালর্ড বুকস*-দেশপাণ্ডে-২০১০)।

জ্যোতিবা ফুলে-এর প্রিয় বই হল— *পেইন-এর লেখা এইজ অফ রিজনস*। জ্যোতিবা-এর লেখা বই-*এ ব্যালার্ড অফ ছত্রপতি*, *প্রিস্ট ক্রাফ্ট এক্সপোজড*, *ব্যালার্ড অফ্ দি ব্রাহ্মণ টিচার* এবং সর্বোপরি *গুলাম গিরি*। জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৯-৩০), সাবিত্রী বাই ফুলে (১৮৩১-৯৭) কর্মজীবনের সময়কাল বিচার করলে ওঁদের মূল্যায়নে জাত শ্রেণি সম্পর্কের সূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর কাজ নয়।

রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৯৭-১৯৭৩)-এর সাধারণ পরিচিতি:-নাস্তিক, আত্মমর্যাদা আন্দোলনের সংগঠক, অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক, নারী স্বাধীনতা প্রশ্নে আপসহীন। এইটুকুই যথেষ্ট নয়। দক্ষিণ ভারতের প্রথম যুগের সাম্যবাদী সিরিঙ্গা ভেলু চেট্টিয়ার (১৮৬০-১৯৪৬)-এর সাহচর্যে পেরিয়ার সমাজবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পেরিয়ার সম্পাদিত কুরি আরাসু সাপ্তাহিক তামিল ভাষায় পত্রিকায় তিনি নিয়মিত মে দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদন রাখতেন। তাঁর লেখা *রুশদেশে কয়েক সপ্তাহ* বইটি কোনোভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাশিয়ার চিঠি* বইটির তুলনায় কম মানের নয়। পেরিয়ারের আহ্বানে তামিলনাড়ুর প্রত্যেকটি শিল্পাঞ্চলে মে দিবসে দলিত-দরিদ্র শ্রমিকদের জামায়ত প্রচার মাধ্যমের প্রথম পাতায় জায়গা পেতো। কুরি আরাসু পত্রিকার দুটি মে দিবস বিশেষ সংখ্যা (১৯৩৩-৩৪) তামিল পাঠকদের কাছে অবশ্য সংগ্রহের তালিকায় পড়ত। তৎকালীন সাম্যবাদী বা সমাজবাদীদের সঙ্গে পেরিয়ার-এর সখ্যতা বৃটিশ শাসকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়। '১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবাসীর দুঃখের দিন' বলাতে পেরিয়ারকে জেলবাস করতে হয়। শ্রেণি সংগ্রামের ফেরিওয়ালাদের কাছে পেরিয়ার এখনও একটি অপরিচিত নাম। দক্ষিণ ভারত তথা তামিলনাড়ুর বাইরে পেরিয়ারের নাম শোনা যায় না।

বি আর আম্বেদকর (১৮৭১-১৯৫৬)-এর সম্পর্কে আম্বেদকারী ও আম্বেদকর বিদ্বেষীদের মধ্যে দু-একটি সাধারণ ধারণার মিল আছে। আম্বেদকর সংবিধান রচনা করেছিলেন এবং সংরক্ষণ নামক একটি ব্যবস্থার প্রচারক ছিলেন। আম্বেদকরকে জানতে হলে এই খণ্ডদর্শনের শিকার হলে চলবে না। আম্বেদকরবাদীদের মধ্যে যাঁরা শ্রেণি শব্দটি শুনলে তার পিছনে কার্ল মার্কস-এর ছবি দেখতে পান তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে আম্বেদকর জীবনের দুটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা যার নাম ভারতের শ্রমিক দল (ইন্ডিয়ান লেবার পার্টি) ও ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগ। শ্রমিক বা ক্লাস সম্পর্কে অন্তত আম্বেদকর-এর কোনো বিতৃষ্ণা ছিল তা বলার মতো তথ্য পাওয়া যায় না। সাম্যবাদী বা সমাজবাদীদের সাথে

বেশ কয়েকবার সুতাকল শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন বা ধর্মঘটে আম্বেদকর অনুগামীসহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। মে দিবসের কর্মসূচিতে শ্রমিক নেতা ডাঙ্গের পাশে তাঁর ছবিও পাওয়া যায়। কিন্তু আম্বেদকর যখন ডাঙ্গের কাছে প্রস্তাব রাখেন যে সুতাকল কারখানার ক্যান্টিনে শ্রমিকদের সহভোজনের ব্যবস্থা করা হোক অর্থাৎ 'অচ্ছুৎ' শ্রমিকদের জন্য ভিন্ন ক্যান্টিন তুলে দেওয়া হোক তখন ডাঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ডাঙ্গে সারাজীবন যা অপরাধ করেছেন তার মধ্যে এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আজকের দিনে শ্রম আইনের যে সমস্ত অংশ শ্রমিকদের কাজে লাগে তার বেশিরভাগই কম্যুনিস্ট সোসালিস্টদের মতোই আম্বেদকর বিশ্বযুদ্ধের আগেই তাঁর দাবিপত্রে পেশ করেছিলেন। ১ মে কে আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস হিসাবে গণও করার দাবি স্বয়ং আম্বেদকর-এর। আম্বেদকর সংবিধান রচয়িতা ছিলেন না। তিনি সংবিধান রচনার খসড়া কমিটির সর্বোচ্চ পদে ছিলেন। খসড়া সংবিধান অন্যদের দ্বারা 'সংযোজিত ও সংমার্জিত' হয়। ফলে ভারতের সংবিধান রচনার দায় বা কৃতিত্ব আম্বেদকর-এর একার নয়। ২৫ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে সংবিধান নিয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেছিলেন:- ''**এ সংবিধান কাজ চালানোর মতো**''। পরবর্তীকালে তাঁর সংবিধান নিয়ে স্বপ্নভঙ্গ হয়। তিনি বলেছিলেন-**আমাকে ঠকানো হয়েছে। আমরা যে দেবতার সৃষ্টি করেছি সে অধিষ্ঠিত হবার আগেই শয়তানরা সেই বেদী দখল করে নিয়েছে**''। ১৯৫২ সালে সংসদে এক বি তর্কে তিনি বলেন:- ''**বলা হয় যে আমি সংবিধান রচনা করেছি। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। আমি এ সংবিধান চাই না। ওটা কারো পক্ষে ভালো নয়**''।

সংরক্ষণ সম্পর্কেও আম্বেদকর হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি- ''**আমার সমাজের শিক্ষিত মানুষেরা আমার সাথে সবচেয়ে বেশি বেইমানি করেছে**''। অন্যত্র তিনি বলেন:- ''**লাঠি (স্ক্রাচ) ভর দিয়ে একজন মানুষ বেশিদিন চলতে পারে না**''।

সংবিধান ও সংরক্ষণের গোলকধাঁধায় আম্বেদকরকে আটকে রাখা আম্বেদকরকে অবমূল্যায়ন করার সামিল। আম্বেদকর কি মার্কসবাদ বিদ্বেষী ছিলেন? যাঁরা একথা বলেন তাঁর *বুদ্ধ অথবা কার্ল মার্কস* (রচয়িতা আম্বেদকর) নামক বইটির কথা তোলেন। এঁরা সম্ভবত রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর কোনো লেখার সাথে পরিচিত নন। ''মার্কসকে গ্রহণ করিতে পারি, নাও করিতে পারি কিন্তু জ্যোতিবাকে ছাড়িব না।'':- আম্বেদকর। আম্বেদকর নাকি কার্ল মার্কস-এর হিংসা ও একনায়কতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন? আম্বেদকর-এর কাছ থেকে জানা যাক—

''অকমিউনিস্ট দেশেও খুনীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসী দেওয়া কি হিংসা নয়? তাহলে একজন সম্পত্তিবানকে কেন খুন করা যাবে না— যদি তার সম্পত্তির অধিকার অন্য মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ হয়? ব্যক্তিমালিকানাকে কেন পবিত্র অধিকার বলে মনে করা হবে?'' অন্যত্র আম্বেদকর লিখেছেন- **''যুদ্ধ ভুল যদি তা সত্য ও ন্যায়ের জন্য না হয়''**।

আম্বেদকর এও লিখেছেন:- ''বৌদ্ধধর্ম হল প্রজ্ঞা, করুণা এবং মমতা। **দেবতা বা আত্মা সমাজকে রক্ষা করতে পারবে না। মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ সমস্ত সমাজকে রক্ষা করতে পারবে। মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ সমস্ত দেশগুলির ধর্মব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।''** এই সময় হিন্দুত্ববাদের গর্জনের প্রেক্ষাপটে আম্বেদকর-এর উক্তি স্মরণীয়- **''যদি সত্য হিন্দুরাজ এদেশে বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা হবে এদেশের এক চরম বিপর্যয়। হিন্দুরা যাই বলুন না কেন হিন্দুরাজের অর্থ হল— স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বকে অস্বীকার।''** (আম্বেদকর রচনাবলী ৮ম খণ্ড-পৃ. ৩৫৮-প্রকাশক মহারাষ্ট্র সরকার)।

হিন্দুত্ববাদকে রুখতে হলে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম উচ্চারণ করতেই হবে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দ্বৈপায়ন সেন লিখেছেন:- ''অবিভক্ত বাংলার শ্রমজীবী কৃষক মানেই দলিত ও ধর্মান্তরিত মুসলমান। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মনে করতেন যে এঁদের সামাজিক-আর্থির নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাতে বাঙালি বর্ণহিন্দু সমাজ এদের মধ্যে ধর্মীয় কোন্দল বাঁধাতে চায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এদের পাণ্ডা ছিলেন।'' দ্বৈপায়ন-এর মতে বাংলায় দলিত-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখতে হলে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নির্দেশিত পথ ধরা ছাড়া হিন্দুত্ববাদকে রোখা সম্ভব হবে না। (*এমার্জেন্স এন্ড ডিক্লাইন অফ দলিত পলিটিক্স ইন বেঙ্গল*-চিকাগো-সেন-২০১২-রাউট লেজ)।

অবিভক্ত বাংলায় এমনকি দেশভাগের পরেও মতুয়া শব্দটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়। সাহেব ধনী, কর্তাভজা, বলাহাড়ী সম্প্রদায়ের তুলনায় মতুয়া ভাবনায় দীক্ষিত লোকজনের সংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু শক্তিপদ ঝা বা সুধীর চক্রবর্তীর গবেষণামূলক প্রবন্ধে মতুয়াদের বিষয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না ফলে বাংলার সুশীল সমাজের কাছে মতুয়ারা ব্রাত্য অথচ হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) এবং তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬-১৯৩৭) যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলায় বিশাল জনজোয়ার তৈরি করেছিলেন তা প্রায় গবেষকদের চর্চার বাইরে থাকে। হরিচাঁদ-এর অবৈদিক অব্রাহ্মণ্য চেতনা সৃষ্টি

ও পরবর্তীকালে গুরুচাঁদ-এর শিক্ষা ও আত্মমর্যাদার আন্দোলন ছাড়াও স্বশিক্ষিত হরি-গুরুচাঁদ যে সামাজিক আর্থিক আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিলেন সেখানে শ্রেণি হিসাবে কৃষকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পশ্চিমী দীপায়নের প্রভাবে নয়, মার্কসীয় বস্তুবাদের শিক্ষায় নয়, বর্ণভেদ ব্যবস্থার পীড়নে জন্ম নিয়েছিল বজ্রশক্তি সম্পন্ন এক নতুন লোকদর্শন।

'কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই'।।

এই ছিল দ্রোহী চিন্তার মূল কথা। আজ যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান ব্যর্থ, তখন ১০০ বছরের পূর্বে বলা হয়েছিল—

খাও বা না খাও তাতে কিছু নাই।
ছেলেপিলে শিক্ষা দেও– এই আমি চাই।।

ধর্মমুক্ত আন্দোলন বা শিক্ষাপ্রচার আন্দোলন ছাড়াও শ্রেণি আন্দোলনে মতুয়া তথা নমো বা নমঃ শূদ্রদের ভূমিকাও আলোচিত হওয়া দরকার। গবেষক শেখ র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নমঃশূদ্রস অফ বেঙ্গল বইতে নমো শূদ্রদের মধ্যে আর্থিক বিভাজনের ইঙ্গিত আছে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবৎকালে বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনকে 'ত্রিফলা' লড়াই বলা হতো।

অত্যাচার করে কত জমিদার গণ
কেহকি তাহাতে বাধা দিয়েছে কখন?
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ
কেহ কি করেছে তার হৃদয় প্রশস্ত?

এই ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে 'অন্ত্যজ' কৃষকদের আন্দোলনের মূল ভাবনা। এর মধ্যে জাত শ্রেণি সম্পর্কের ইঙ্গিত কি ধরা যাচ্ছে? হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বংশধরদের নানাবিধ কুকর্মের জন্য তো একটি সম্প্রদায়ের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যায় না?

বাংলায় কি জাতভেদ আছে? 'প্রগতিশীল' পশ্চিমবঙ্গ কি জাতভেদকে অগ্রাহ্য করেছে? 'নালায়েক'দের বোধোদয়ের জন্য আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে 'পাত্র চাই পাত্রী চাই'-এর পৃষ্ঠাগুলি দেখার জন্য অনুরোধ করা যায়।

এক কোপে একজনের মুণ্ড কেটে নেওয়া খুন— আইনতঃ অপরাধ। আর একজন অভাবের তাড়নায় অনাহারে তিল তিল করে রোজ মৃত্যুর দিকে এগোতে এগোতে মরে গেল— সেটা হত্যা নয়? দ্য পলিটিক্স অফ কাস্ট

ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (প্রকাশক-রুটলেজ-২০১৬) বইটিতে উদয় চন্দ্র, সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনসূয়া বসু রায়চৌধুরী, দ্বৈপায়ন সেন, প্রাস্কর্ণ সিংহরায়, ইন্দ্রজিত রায়, মৌমিতা সেনদের যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছে সেখানে দলিতদের পিছনে দারিদ্রের ছাপ পাওয়া যায়। আকাডেমিয়া জগতে এখন অনেককে পাওয়া যাবে যাঁরা জাত-শ্রেণি সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি বা এখনো করেন না। শ্রীমতি দেবী চ্যাটার্জী, শ্রীমতি শিপ্রা মুখার্জী, সনৎ নস্কর, সুভাষ মিস্ত্রি, শিপ্রা সরকার, জয়দীপ ষড়ঙ্গী, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরঞ্জন মিদ্দে, দেবস্মিতা দেব, কণিষ্ক চৌধুরী সহ বহু চিন্তকদের এই তালিকায় পাওয়া যাবে। ইতিহাস চর্চায় অবৈদিক, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধে পথপ্রদর্শকদের মধ্যে অবশ্যই ডি.ডি. কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্যর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এ ধারার পতাকাবাহীদের মধ্যে প্রথম নাম রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। মুক্ত চিন্তার প্রভাব বর্তমান গবেষকদের মধ্যে পড়বে তাতে সংশয় থাকার কথা নয়, আজকাল যাঁদের অ্যাকটিভিস্ট বলা হয় তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কর্মজীবনের মধ্যে প্রবন্ধ রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলায় জাত শ্রেণি সম্পর্কে গত চার দশক ধরে কাজ করে চলেছেন, এমন কয়েকজনের মধ্যে নকশালবাদী রাজনৈতিক নেতা সন্তোষ রাণা ও আলোক মুখার্জীর নাম সামনে চলে আসে। প্রয়াতদের মধ্যে অবশ্যই খোকন মজুমদার-এর নাম বলা দরকার। আলোক মুখার্জী লিখেছেন:- ''**জাতি-জাত ব্যবস্থায় বিলুপ্তির প্রচেষ্টা ও শ্রেণি শোষণের অবসানের লড়াই-এর মধ্যে কোনো কামরা বন্ধ সম্পর্ক নেই। এই যাত্রাপথ সমান্তরাল নয়, বিপরীতমুখী তো নয়ই। এরই দুটি ধারা পরস্পরের পরিপূরক এবং গভীর সম্পর্কযুক্ত।**'' (জনশক্তি-জুন-১৭-বিজয়ওয়াড়া-অনুবাদ কণিষ্ক চৌধুরী)। পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী— (সন্তোষ রাণা ও কুমার রাণা-ক্যাম্প- কলকাতা-২০০৯) বইটিতে যেসব তথ্য আছে তাও জাত শ্রেণি সম্পর্ককে বোঝার পক্ষে সহজ। বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি (ওবিসি) সংরক্ষণ প্রশ্নে তখন উত্তাল। ভক্তিভূষণ মণ্ডল-এর সভাপতিত্বে মণ্ডল কমিশনে অ্যাকশন কমিটি তৈরি হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লক ছাড়াও সিপিআই, আরএসপি এই আন্দোলনের শরিক হয়। জনতা দলও এই আন্দোলনে শরিক হয়। নকশালবাদীদের মধ্যে তৎকালীন বিনোদ মিশ্র-এর গোষ্ঠী ও বর্তমানের 'মাওবাদী'রা দূরেই ছিলেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (তথ্যসূত্র দেওয়া গেল না) ভক্তিভূষণ মণ্ডল কলকাতার ধর্মতলার এসপ্লানেড ইস্টে বিশাল সমাবেশে দেরিতে উপস্থিত হয়ে কৈফিয়ৎ

দেন- 'আজ বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বৈঠক ছিল যার মধ্যে মণ্ডল কমিশনের নির্দেশ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা নির্ধারিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পরিষ্কার জানালেন--- এ রাজ্যে জাতিভেদ নেই। ব্যাকওয়ার্ড ফরোয়ার্ড নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। আমি (ভক্তিভূষণ মণ্ডল) বললাম— একথা কী করে বলছেন? আপনার পাশে বিনয় চৌধুরী বসে আছেন। উনি উগ ক্ষত্রিয়, বর্ধমানে ওনাদের 'আগুড়ে' সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে পরিচয়। মণ্ডল কমিশনের আওতাভুক্ত সম্প্রদায়। জ্যোতি বসু হাল্কা সুরে বললেন— বিনয় বাবু আপনি ক্ষত্রিয়? তারপরেও উগ্র? আপনাকে নিয়ে তো নতুন করে ভাবতে হবে। মন্ত্রীসভার বৈঠক এরপর চলেনি। আমি ব্যর্থ হয়ে চলে এলাম'। দুঃখ লাগে- বিনয়দা চুপ করে থাকলেন।

সিপিআই নেতা নীহার মুখার্জী বলেন— মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে জাত ভিত্তিক সংরক্ষণের দাবি তুলে এতকালের পরিচিত পথ ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছি না তো? নিজের মনকে দিয়ে ভাবছি দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আরএসপি-র শ্রমিক নেতা সুনীল সেনগুপ্ত অন্যভাবে বক্তব্য রাখেন:- আমি এই বিশাল সভায় এতো মানুষের সামনে স্বীকার করতে রাজি আছি যে সংরক্ষণ কোনো রোগ নিরাময় ঔষধ নয়। ব্যথা বেদনার আপাতত নিরাময় বা প্রাথমিক চিকিৎসার মতো ব্যাপার কিন্তু যখন নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি যে আমার পদবী সেনগুপ্ত না হয়ে কিস্কু বা হেলা যদি হতো তবে আমি কি কোনো দলের নেতৃত্বে যেতে পারতাম? সিপিআই(এমএল) নেতা আলোক মুখার্জী বলেন:- মঞ্চে ওঠার আগে এক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন--- আপনি মুখার্জী তারপর কমিউনিস্ট বিপ্লবী। আপনি এখানে কেন? আমি তাকে যা ব লিনি তা আপনাদের বলছি- যদিও আমি প্রায়শ্চিত্ত শব্দটিকে অর্থহীন মনে করি, কিন্তু কোনো বিকল্প শব্দ খুঁজে না পেয়ে আমি বলছি যে মুখার্জীই হই বা কমিউনিস্ট হই, আমি এবং আমরা আমাদের পূর্ব প্রজন্মের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমরা মনে করি জাত ব্যবস্থা উচ্ছেদের আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামের মাঝে কোনো 'চীনের দেওয়াল' তৈরি করা নেই। ওবিসি আন্দোলনের তৎকালীন নেতা আইনজীবী অরুণ মাজি বলেন— 'সংরক্ষণ ব্যতিরেকে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না'।

বাংলা দলিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা না করলে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের পরে বাংলা দলিত সাহিত্য দুনিয়ার দুটি নাম বারবার উঠে আসে। মনোরঞ্জন ব্যাপারী (পশ্চিমবঙ্গ), হরিশংকর জলদাস (বাংলাদেশ)। দুজনেই সাধারণভাবে জাতভেদ ব্যবস্থার শিকার এবং বিরোধী। এছাড়াও

চেতনা লহর

মার্কসবাদে আস্থাশীল। এঁদের লেখা বই পড়লে জাত-শ্রেণি সম্পর্কের প্রতি কৌতুহল বাড়বে। চতুর্থ দুনিয়া প্রকাশ সংস্থা শতবর্ষে বাংলা দলিত সাহিত্য ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশ করেন। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। ৮১ জন দলিত সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা সম্বলিত উঁচুমানের এই সংকলনটি সাহিত্যিকদের জাতপরিচয় জানানো হয়েছে। শ্রেণি পরিচয় তেমন গুরুত্ব পায়নি। দলিত সাহিত্য মহলে একটি বিতর্ক চালু আছে। একদল মনে করেন যে দলিত ঘরে না জন্মালে দলিত সাহিত্যিক হওয়া যায় না। যিনি লিখেছিলেন- মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গনের দ্বারে ভিতরে প্রবেশ করি সে সাধ্য ছিল না একবারে তিনিই (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তো শূদ্রধর্ম নামক প্রবন্ধে জাত ভেদের নিন্দা করেছেন।

ডি ডি কোসম্বী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁদের প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্মম সমালোচনা করেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী লিখিত *মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী* বইটিতে দুটি প্রবন্ধে (শূদ্র বনাম ব্রাহ্মণ, হরিজন আন্দোলনের নব দর্শন) ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ও মোহনদাস গান্ধীকে লেখক তুলোধোনা করেছেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চেতনা লহর পত্রিকায় লিখেছেন:- ''বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে আধুনিক কালের সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় সাধারণত জাতপাতের কথা তোলা হয় না, যদিও অনেক বর্ণহিন্দুর রচনাতেই তথাকথিত নিচু জাতির লোকজন প্রায়ই হেয় বা হাস্যকর চরিত্র হয়ে দেখা দেন। কিন্তু এর বাইরেও একটা ব্যাপার আছে। সেটি হল বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বনাম অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব। রাহুল সাংকৃত্যায়ন যাকে বলতেন, ''হিন্দু ব্রাহ্মণ শাহী'' (*নবদীক্ষিত বৌদ্ধ*-লক্ষ্ণৌ:— বুদ্ধ বিহার-১৯৮২ পৃ. ১৫)। বাংলায় কেউ কেউ যাকে বলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তার বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্রই বোধহয় প্রথম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন। ('গলায় দড়ে জাত প্রায় বড় ধূর্ত— অন্ত পাওয়া ভার'-পরিচ্ছেদ ৮)।'' প্যারীচাঁদ মিত্র-এর ঢিল মৌচাকে পড়েছিল ব লেই ব্রাহ্মণ 'কুলশ্রেষ্ঠ' রামগতি ন্যায়রত্ন উষ্মা প্রকাশ করে লিখেছিলেন— 'টেকচাঁদ বাবুর ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি যেন বেশ কিছু বিদ্বেষ আছে বোধহয় (বাঙালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব-সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার-১৯১৯-পৃ. ২৫৭)।

পরিশেষে দু-একটি অপ্রিয় সত্যকথা জানাতে চাই। কার্ল মার্কস ভারতবর্ষ বিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন তা পড়লে কার্ল মার্কসকে সফল ভারতচর্চাবিদ বলা সঙ্গত হবে না। এ নির্মম সত্যটি ধরতে পেরেছিলেন ডি ডি কোসম্বী। তিনি মার্কসীয় পদ্ধতিতেই মার্কস-এর খণ্ডদর্শনের বিরোধিতা

করেছিলেন।

জাত বা সম্প্রদায়ভিত্তিক গণসংগঠন গড়া কি শ্রেণি সংগ্রামকে ব্যাহত করে? তবে ছাত্র, যুব ও মহিলাদের শাখা সংগঠন গড়ার যৌক্তিকতা কী? ছাত্ররা শিক্ষায়তনের মধ্যে ও বাইরে নানা অসুবিধার বিরুদ্ধে লড়াই করে কিন্তু ছাত্রসমাজ তো নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির নয়। যুবসংগঠনও একই ধরনের কাজ করে। মহিলাদের সংগঠন গড়ার প্রাথমিক কাজ সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতাকে দূর করা যা প্রথাগত শ্রেণি সংগ্রাম নয়।

আজও ভারতের মার্কসবাদী-সমাজবাদীদের বড় অংশ ইউরোপীয় চশমা পরে ভারতের বর্ণ-বর্গভেদ সমস্যার সমাধান করতে চাইলে তা পর্বতের মূষিক প্রসব হবে। বৈচিত্রময় ভারতে জাত বর্ণ-র উচ্ছেদ ও শ্রেণি শোষণের অবসান কর্মসূচির মধ্যে আমরা এক অস্তিত্বহীন অশরীরি প্রাচীর নির্মাণ করে চলেছি তাকে বিনির্মাণ করে ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়ানস (USI) পুনর্নির্মাণ করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য'র প্রাণভোমরা